

# সমতলে বিছানো হির পৃথিবী

(৩য় খন্ড)

ছদ্মবিজ্ঞানের বেড়াজালে সৃষ্টিতত্ত্ব

লেখক, সংকলক ও সম্পাদক: রুহ মাহমুদ

সমতলে বিছানো হির পৃথিবী  
(৩য় খন্ড)  
ছদ্মবিজ্ঞানের বেড়াজালে সৃষ্টিতত্ত্ব।

লেখক, সংকলক ও সম্পাদক: রুহ মাহমুদ।

সূচিপত্র:

ভূমিকা:

কম্পাসের ইতিহাস, কার্যক্রম, কম্পাস ছাড়া দিক নির্ণয়ের কৌশল এবং প্রকৃতির উপর দিকের প্রভাব।

ডার্ক টাওয়ারের (অবলেসিক) সাথে নর্থ পোল ও কম্পাসের সম্পর্ক এবং সমতলে ইহার কার্যক্রম।

কম্পাস দ্বারা কেবলা নির্ণয়ের পদ্ধতি।

স্যাটানিস্ট নিউটন ও তার কথিত গ্রাভিটির ব্যবচ্ছেদ:

মধ্যাকর্ষণ শক্তির অযৌক্তিকতা

অভিকর্ষ: রক্তে মাংসের মানুষ, জীব বা উদ্ভিদ কে কিভাবে আকর্ষণ করে?

বিজ্ঞানপ্রেমীরা “কিফাতান” শব্দটি দিয়ে গ্রাভিটি প্রমাণ করতে চায়:

নিউটনকে কেন কথিত মহাকর্ষ বলের আবিষ্কারক বলা হচ্ছে?

নিউটন ছিল একজন প্রসিদ্ধ আলকেমিস্ট।

শয়তানের বাচ্চা নিউটন

নিউটন, বিড়াল ও তার বর্তমান উত্তরসূরীরা:

গুগল ম্যাপ, জিপিএস, আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও স্যাটেলাইটের ব্যবচ্ছেদ:

স্যাটেলাইট থিওরি: বাস্তব ও সঠিক তথ্য জেনে নিন।

টাইপ ১,২,৩ সিভিলাইজেশনের ধোঁকা:

মানুষ কী আসমানের প্রান্তসীমা অতিক্রম করতে পারবে? পবিত্র কুরআন কী বলে?



আকাশ জয় কি সম্ভব? প্রসংগ সূরা আর রাহমানের ৩৩ নং আয়াত। ডাঃ মরিস বুকাইলির ব্যাখ্যাতে বিশেষ পর্যালোচনা:

চাদ ও কথিত মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার প্রশ্নই আসেনা:

চাঁদে অবতরণ ছিল সিনেমা, দৃশ্য ধারণ করেছি আমি:

নীল আর্মস্ট্রং কে নিয়ে মুসলিমসমাজে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা ও যুক্তিখণ্ডন :-  
মহাশূন্যে নভোচারীদের মানবেতর জীবন যাপন :

প্রতারক নাসার অন্ধকারাচ্ছন্ন পথচলা যেভাবে শুরু হয়:

বিজ্ঞান হলো বিশাল মিথ্যার একটি ইকোসিস্টেম।

বিজ্ঞান প্রেমীরা বিজ্ঞানমনস্ক নয়, বরং বিজ্ঞানান্ধ :

অপবিজ্ঞান দিয়ে কখনোই মুসলিমদের উন্নয়ন সম্ভব নয়:

কাফেরদের মিথ্যা থিওরীগুলোকে কুরআন দিয়ে সত্যায়ন?

অপবিজ্ঞানের থিওরির অপেক্ষায় না থেকে নিজে কুরআন গবেষণা করুন:

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা গুলো, মানুষকে সুবহানআল্লাহ বলতে বাধা দিচ্ছে:

নাসা ও অপবিজ্ঞানের প্রতি এই অন্ধ ভক্তি কবে দূর হবে?

নাসা প্রেমী ভাইয়েরা কাফেরদের কাছে সম্মানিত হতে চায়:

নাস্তিকদের কাছে নিজেও অপমানিত হচ্ছেন, ইসলামকেও অপমানিত  
করছেন:

বলাকার পৃথিবী তত্ত্বটি অবৈজ্ঞানিক ও বিবেক বহির্ভূত:

কল্পবিজ্ঞান প্রেমী নেক্সট প্রজন্মের কলমে সূরা নাসের তাফসীর:

বিজ্ঞানময় নাকি হেকমতপূর্ণ / জ্ঞানগর্ভ / প্রজ্ঞাময় কুরআন?

আউটার স্পেস, ভ্যাকুয়াম চেম্বার বনাম বাস্তবতা:



কার্ভেচার সমাচার :(মুত্তাকী বনাম মডারেট)

মুসলমান বিজ্ঞানী নয়, বরং কাফের

দার্শনিক ইবনে সিনার আক্বিদা, ধর্মীয় বিশ্বাস..!

ইবনে সিনা সম্পর্কে অজানাকে জানুন! তিনি মুসলিম  
নাকি কাফির?

“প্যারাডক্সিক্যাল\_সাজিদ এ আক্বীদাগত বিভ্রান্তি।”

উপসংহার:

## ভূমিকা:

সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবীর ৩য় খণ্ডটি আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ। ১ম খন্ডে দলিল প্রমান দিয়ে শাইখ আসাফির "পৃথিবী সমতল ও স্থির" এটা প্রমান করেছেন।

২য় খন্ডে, সমতল পৃথিবীতে প্রাকৃতিক ঘটনাবলী কিভাবে ঘটে সেসব বিষয়ে, সব লিখাকে একত্র করা হয়েছে।

যারা ১ম ও ২য় খন্ড পড়েননি, তারা আগে ওগুলো পরে নিন।

**সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবীর ১ম খন্ড: (পৃথিবী সমতল ও স্থির। বলাকার ও ঘূর্ণায়মান নয়।)**

Blog link: <https://toorpaahaar.blogspot.com/2021/02/blog-post.html>

PDF link:

<https://drive.google.com/file/d/13S5cIIzdY62BZdbDZ305UWR9E9EaCiXh/view?usp=sharing>

**সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবী (২য় খন্ড)। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী।**

Blog link: <https://toorpaahaar.blogspot.com/2021/02/blog-link-httpstoorpaahaar.html>

PDF link: [https://drive.google.com/file/d/1Bu\\_tHvAH\\_ltoEKUtRFS9mYDqpnBU3HuB/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1Bu_tHvAH_ltoEKUtRFS9mYDqpnBU3HuB/view?usp=sharing)

আর ৩য় খন্ডে ছদ্ম বিজ্ঞানের বেড়াজালে সৃষ্টি তত্ত্বের দুর্গতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবং এইসব কল্প ও ছদ্ম বিজ্ঞানের মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। ভুল ত্রুটির জন্য আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। অফিসের কাজের ফাঁকে, একা এসব কাজ করতে হয়। তাই ভুল থাকটাই স্বাভাবিক। জাজাকুমুল্লাহ।

-Rooh Mahmood-

## কম্পাসের ইতিহাস, কার্যক্রম, কম্পাস ছাড়া দিক নির্ণয়ের কৌশল এবং প্রকৃতির উপর দিকের প্রভাব:

কম্পাসের জন্ম কীভাবে হল?

কম্পাস দিকেই ফেরানো যাক না কেন, এর কাটা উত্তর-দক্ষিণ হয়েই থাকবে, যদি না আশে পাশে কোন শক্তিশালী চুম্বক থাকে।

কম্পাস আসলে কি? এটা আসলে নিজেই একটা চুম্বক। দণ্ড আকৃতির এই চুম্বকটির ঠিক মাঝ বরাবর জায়গায় একটি পিভট পয়েন্ট ব্যবহার করে শূন্যে ভাসিয়ে রাখলে সেটা নিজে থেকেই উত্তর-দক্ষিণ দিকে তাক করে থাকে।

এটা কেন উত্তর-দক্ষিণ দিকে তাক করে থাকে সবসময়? এটার উত্তরটা আরও বেশি চমকপ্রদ। শুরুতেই বলেছি, আশে পাশে কোন শক্তিশালী চুম্বক থাকলে কম্পাসের কাটা সেদিকে ঘুরে যায়। তাহলে কি অন্য সময়ও এটা আরও বড় কোন চুম্বকের দিকে তাক করে থাকে?

আমাদের পৃথিবী নিজেও একটা বিশাল চুম্বক। এরও আছে উত্তর এবং দক্ষিণ। কম্পাসের কাটাও তাই উত্তর দক্ষিণ দিকে তাক করে থাকে এই বিশাল চুম্বক দ্বারা প্রভাবিত হয়ে।



## ইতিহাস:

বর্তমান সময়ে কম্পাস খুব সহজ-সরল একটা বিষয় মনে হতে পারে। কিন্তু এই কম্পাস আবিষ্কারের পেছনেও রয়েছে বিশাল ইতিহাস। ইউরোপিয়ানরা যখন প্রথম আমেরিকায় যাবার পরিকল্পনা শুরু করে তখনই তারা একটা দিক নির্দেশক যন্ত্রের অভাব অনুভব করে। তারা পরিষ্কার দিনের আকাশের সূর্য কিংবা রাতের আকাশের নক্ষত্র বিশেষ করে নর্থ স্টার বা স্ক্যা-তারার অবস্থান দেখে দিক নির্ণয় করতেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে আকাশ পরিষ্কার না থাকলে কিংবা ঝড় বা কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দিক নির্ণয় করা শুধু কষ্টসাধ্যই নয়, অনেকটা অসম্ভব ছিল। এই সীমাবদ্ধতাও তাদেরকে কম্পাস আবিষ্কারে আরও বেশি উৎসাহিত করে।

অবশ্য তারও আগেই প্রাচীনকালের মানুষেরা ম্যাগনেট বা চুম্বকের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছিল যে ম্যাগনেট কে ঝুলিয়ে রাখলে এর এক প্রান্ত সবসময় নর্থ স্টারের দিকে মুখ করে থাকে অর্থাৎ, নর্থ স্টারকে নির্দেশ করে। ধারণা করা হয় ১৩ শতকের দিকে ইউরোপিয়ানরাই এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই কম্পাস বা দিক নির্দেশক যন্ত্রের আধুনিকায়ন করে। তবে এমন কথারও প্রচলন আছে যে আরবরাই প্রথম চীনাদের তত্ত্ব অনুসরণ করে কম্পাস আবিষ্কার করে। মূলত সারা বিশ্বের বিভিন্ন অবস্থান

থেকে সহজে কাবা-ঘরের অবস্থান বের করার উদ্দেশ্যে তারা এটা নিয়ে কাজ করে বলে জানা যায়। দৈনিক পাঁচ-ওয়াক্ত নামাজ পড়ার জন্য কাবা শরীফের অবস্থান জানা জরুরী ছিল মুসলমানদের জন্য। বিভিন্ন তথ্য নির্দেশ করে যে খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতকে চায়নিজরা চুম্বকের এই দিক নির্দেশক গুণাবলী আবিষ্কার করে। এর আগে চুম্বকের লোহা এবং অন্যান্য ধাতব আকর্ষণ করার ক্ষমতা নিয়ে তারা জানত, কিন্তু সেটা নিয়ে তেমন কোন কাজ তারা করেনি। বিষয়টা মূলত মজা হিসেবেই দেখত তারা। এর পরে দিক নির্দেশক গুণাবলী আবিষ্কার করার পরেও তারা লম্বা সময় এটাকে গোপন রেখে ভবিষ্যৎ বলার যন্ত্র হিসেবে সবাইকে ধারণা দিয়েছে। আবিষ্কারের প্রায় কয়েকশ বছর পরে এটাকে কার্যকরী-ভাবে দিক নির্দেশক যন্ত্র হিসেবে তারা ব্যবহার শুরু করে।

১৪ শতকের দিকে কম্পাসের ব্যবহার বেড়ে গিয়ে একটা সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়। বর্তমান বিজ্ঞান দিক নির্দেশনার জন্য হাজারো প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে, কিন্তু এ সব কিছুর শুরুটা কিন্তু হয়েছিল এই সাধারণ একটা কম্পাসের মাধ্যমেই।

### কম্পাস ছাড়া দিক নির্ণয়

কম্পাসের সাহায্যে দিক নির্ণয় করা এখন বেশ সহজ। কিন্তু হাজার বছর ধরে মানুষ কম্পাস ছাড়া দিক নির্ণয় করে আসছে। সেটা হোক সমুদ্রে মুরুভূমিতে কিংবা

পাহাড়ে। চুম্বক আবিষ্কারের আগে এই কাজটা বেশ কঠিন ছিলো। প্রায় ৪০০০ বছর আগের কথা। গল্প শোনা যায় চুম্বকের আবিষ্কার হয়েছিল এশিয়া মাইনরে, আবার কারও মতে গ্রিসের ম্যাগনাস এলাকায়। যেখানেই হোক, চুম্বক আবিষ্কারের পরে মানুষ আবিষ্কার করে যে এটার দুই মাথা সবসময় উত্তর দক্ষিণ দিকে তাক করা থাকে। এর পরে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি মানুষকে।

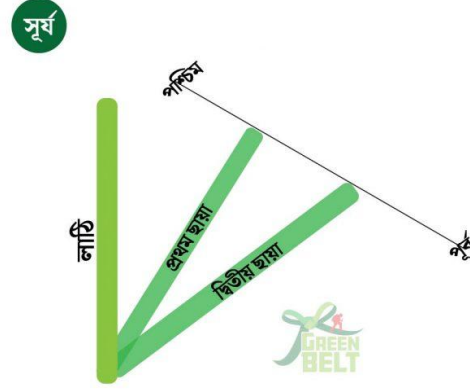
### চন্দ্র সূর্য:

চন্দ্র প্রতিদিন না উঠলেও সূর্য প্রতিদিন উঠে। পূর্বে তাদের উদয় হয়, পশ্চিমে অস্ত। এটা সহজ হিসেব। সময়টা যদি হয় সকাল কিংবা বিকেলের দিকে, তাহলে আপনার জন্য দিক নির্ণয় করা সহজ হয়ে গেল অনেকটাই। যদি সকাল হয়, তাহলে সূর্য কমবেশি পূর্ব দিকে হেলে থাকবে। যদি বিকেল হয়, তাহলে সূর্য কমবেশি পশ্চিম দিকে হেলে থাকবে। সেখান থেকে আপনি দিকের ধারণা পেয়ে যাবেন। এটা খুব নিখুঁত না হলেও সবচেয়ে দ্রুত এবং সহজ পদ্ধতি। সূর্য পূর্ব থেকে পশ্চিমে যায়, শীতকালে খানিকটা দক্ষিণে এবং গ্রীষ্মকালে খানিকটা উত্তরে হেলে থাকে (বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান অনুযায়ী)। কিন্তু দুপুর ১২ টায় আপনি কী করবেন?

### সূর্যের ছায়া দেখে দিক নির্ণয়

একটা জিনিস আমরা সবসময় জানি সূর্য পূর্ব থেকে পশ্চিমে যায়। সুতরাং সূর্যের ছায়া পশ্চিম পূর্বে যাবে। সূর্যের আলো আছে এরকম জায়গায় একটা লাঠি খাড়া সোজা করে মাটিতে পুঁতবেন। ওটার ছায়ার মাথা বরাবর একটা দাগ দিন। পনের মিনিট ছায়া কিছুটা সরে গেলে আবার ছায়ার মাথা বরাবর আরেকটা দাগ দিন। দুইটা দাগ বরাবর সোজা রেখা টানলে তা পূর্ব-পশ্চিম নির্দেশ করে। যে দাগ প্রথম দিয়েছিলে সবসময়েই পশ্চিম।





### হাতঘড়ি দিয়ে দিক নির্ণয়

এনালগ কাঁটাওয়ালা ঘড়ি দিয়েও দিক নির্ণয় করতে পারবেন। ঘড়িকে মাটিতে বা সমতল কোন জায়গায় রাখেন। ঘন্টার কাঁটা সূর্য বরাবর রাখবেন। এরপর বারোটোর দাগ আর ঘন্টার কাঁটার মাঝ বরাবর মনে মনে একটা দাগ টানেন। এই দাগের দুই প্রান্ত হচ্ছে উত্তর আর দক্ষিণ। এখন কোন প্রান্ত উত্তর আর কোনটা দক্ষিণ এটা বোঝার জন্য পূর্ব পশ্চিম চিনতে হবে। পূর্ব পশ্চিম চেনা সোজা। সূর্য পূর্ব থেকে পশ্চিমে যায়।



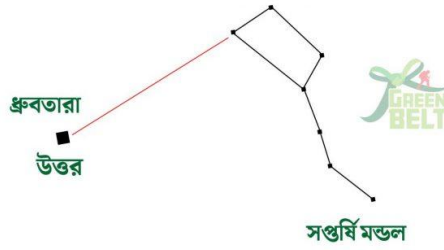
হাতঘড়ি দিয়ে দিক নির্ণয়

### তারা দেখে অবস্থান

ঠিক সন্ধ্যা বেলায় আপনি পশ্চিম আকাশের দিকে তাকালে দিগন্তরেখায় যে উজ্জ্বল তারাটি দেখতে পান, সেটিকে আমরা বলি সন্ধ্যাতারা / শুকতারা।

## ধ্রুবতারা ও সপ্তর্ষি মন্ডল

রাত বাড়ার সাথে সাথে সমস্ত নক্ষত্র দিক পরিবর্তন করে। শুধুমাত্র একটা তারা স্থির থাকে। সেই নক্ষত্রকে আমরা বলি ধ্রুবতারা। এই ধ্রুবতারা বিশুদ্ধ উত্তর দিক নির্দেশ করে। কথা হলো ধ্রুবতারা আপনি কিভাবে খুঁজে বের করবেন? ধ্রুবতারা বের করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে সপ্তর্ষি মন্ডল খুঁজে বের করতে হবে। সপ্তর্ষি মন্ডল আমরা সবাই চিনি। এই মন্ডল এর সামনের দুইটা তারা বরাবর দাগ টানলে আকাশে উজ্জ্বল যে তারাটা পাওয়া যায় ওটা ধ্রুবতারা। ওটাই উত্তর দিক।



## বাস্তুতে (হিন্দুইজমের একটি থিওরি) দিকের প্রভাব

পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ। বাস্তুতে এই চারটি দিকের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। ইমারত গঠনের সময় এই বিষয়ে জ্ঞান থাকা জরুরি। আগেকার দিনে সূর্যের ছায়া দেখে দিকের হিসেব করা হত। এখন ম্যাগনেটিক কম্পাসের মতো উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে নিখুঁত ভাবে দিক নির্ণয় করা হয়। সাধারণ ভাবে চারটি প্রধান দিক নিয়ে হিসেব হলেও বাস্তুমতে মোট দশটি দিক রয়েছে। তবে কম্পাসে আটটি দিকের হদিশ পাওয়া যায়। কম্পাস মোট ১৮০ ডিগ্রি পর্যন্ত ঘুরতে পারে। প্রতিটি দিকের

জন্য ৪৫ ডিগ্রি করে নির্দিষ্ট রয়েছে। প্রতিটি দিকের জন্য ডিগ্রির স্তর পরীক্ষা করে নেওয়া প্রয়োজনীয়।

উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম - এই মূল চারটি দিক ছাড়াও আরও চারটি উপদিক রয়েছে। এগুলি সবসময় কোণাকুনি ভাবে অবস্থান করে। এগুলি হল -

উত্তরপূর্ব কোণ বা ঈশান কোণ

দক্ষিণপূর্ব কোণ বা অগ্নি কোণ

দক্ষিণপশ্চিম কোণ বা নৈঋত কোণ

উত্তরপশ্চিম কোণ বা বায়ু কোণ

বাস্তুমতে নবম দিক হল আকাশ ও দশম দিক হল পাতাল।

উত্তর - বাস্তুমতে উত্তর দিক অত্যন্ত শুভ হিসেবে বিবেচিত। এই দিকের অধিপতি হলেন হিন্দু মতে ধন-সম্পত্তির দেবতা কুবের। সেই কারণে উত্তর দিককে অর্থ ও পেশাগত উন্নতির দিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বুধ হল উত্তর দিকের গ্রহ।

বাস্তুপুরুষের বুক ও পেট উত্তর দিকে থাকে। তাই ঘরের উত্তর দিক সব সময় খোলামেলা, আলোকজ্জ্বল ও সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা জরুরি।



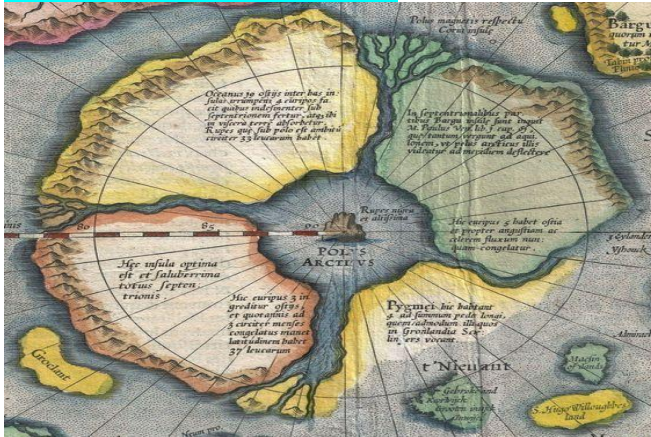
আধুনিক বাস্তুবিশেষজ্ঞদের মতে উত্তর মেরুর কারণে উত্তর দিক থেকে প্রচুর



পরিমাণে শক্তি নির্গত হয়। এই শক্তি বাড়ির সকল সদস্যের জন্যই প্রয়োজনীয়।  
তাই উত্তর মেরুর পজিটিভ শক্তি বাড়ির মধ্যে যাতে ভালোভাবে প্রবেশ করতে  
পারে, সে জন্য উত্তর দিক খোলামেলা রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন বাস্তু বিশেষজ্ঞরা।

**N:B (RM):** বাস্তুমতের আলোচনাটি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আর  
এটা ইসলামের সাথে যথেষ্ট সাংঘর্ষিক তাতো আপনারা বুঝতেই পারছেন।  
এটা হিন্দুইজমের একটি থিওরি। এগুলোতে বিশ্বাস করার প্রশ্নই আসেনা।  
তবুও এই অংশটুকু আনার বিশেষ কারণটি পরবর্তী আলোচনা থেকে বুঝতে  
পারবেন ইনশাআল্লাহ।

## ডার্ক টাওয়ারের (অবলেনসিক) সাথে নর্থ পোল ও কম্পাসের সম্পর্ক এবং সমতলে ইহার কার্যক্রম:



তাদের এই কথাটুকু খেয়াল করুন। ((বাস্তুমতে উত্তর দিক অত্যন্ত শুভ  
হিসেবে বিবেচিত। এই দিকের অধিপতি হলেন হিন্দু মতে ধন-সম্পত্তির দেবতা

কুবের। সেই কারণে উত্তর দিককে অর্থ ও পেশাগত উন্নতির দিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বুধ হল উত্তর দিকের গ্রহ।)))



আমরা জানি, হিন্দুরা যাদেরকে দেবতা মনে করে, তারা আসলে জীন। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ধ্রুবতারাতে একজন জীন আছে। আর এই জীন বা তারকা থেকে শক্তি নির্গত হয়। ব্যাপারটাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায়না। কারণ পৃথিবীতে দুটো নর্থ পোল আছে। একটি ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক। আরেকটি ম্যাগনেটিক বা কৃত্রিম। চুম্বক বা কম্পাস দুইদিকেই তাক করে। অর্থাৎ কিছু কিছু ক্ষেত্রে কম্পাস সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারেনা, এ কারণেই উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি, একটি চুম্বককে ঝুলিয়ে দিলে তা নর্থ স্টারের দিকে মুখ করে। কারণ সেখান থেকে একটি শক্তি নির্গত হয়। আবার কম্পাস সাধারণত নর্থ পোলকে নির্দেশ করে। অথচ নর্থ পোল খুব রেসিস্টিভ একটি অঞ্চল। অনেকগুলো দেশ সেখানে নিরাপত্তা বেষ্টনী দিয়ে রেখেছে। কারণ সেখানে আছে ডার্ক টাওয়ার বা স্যাটার্নিক টাওয়ার।

বর্তমানে যেটাকে মনোলিথ নাম প্রচার করা হচ্ছে। আর অনেক আগে থেকেই আমরা এটাকে অবলেনসিক নামে চিনি। মক্কায় যেটাকে (শয়তানের প্রতীক) উদ্দেশ্যে করে

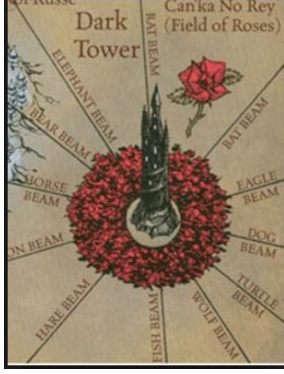
টিল ছুড়া হয়। সম্ভবত এই টাওয়ার টি থেকেও একটি শক্তি নির্গত হয়। ফলে কম্পাস ওদিকে মুখ করে থাকে।



আল্লাহ্ আলম। যদিও প্রচলিত বিজ্ঞান আমাদেরকে বলে যে, ওখানে একটি প্রাকৃতিক ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে। সেটা থাকতেও পারে। আবার নাও থাকতে পারে। এমনও হতে পারে যে, ওই ডার্ক টাওয়ারকেই ম্যাগনেটিক ফিল্ড বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও ওখানে আরো অনেক রহস্য থাকতে পারে। যেমন: মাটির নিচের জগতে বা জিনদের জগতে যাওয়ার পোর্টাল বা অন্য কিছু।

যার কারণে ওখানে এতো কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আল্লাহ্ আলম। এই ডার্ক টাওয়ার বা আর্কটিক সার্কেলের আরো কয়েকটি নাম আছে। যেমন: ব্যাড ল্যান্ড, আজরা বা আসগার্ড, রেড রোজ, ইডেন ল্যান্ড, ডেভিলস টাওয়ার ইত্যাদি। এই টাওয়ারের আদলে পৃথিবীতে অসংখ্য টাওয়ার বা বিল্ডিং তৈরী হয়েছে।



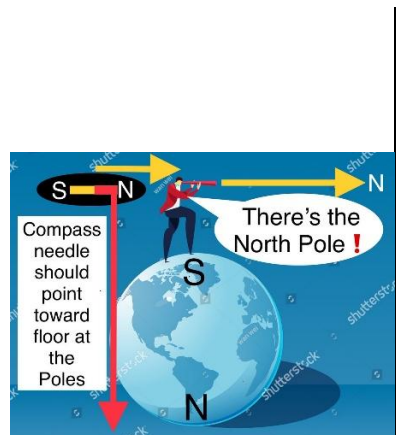
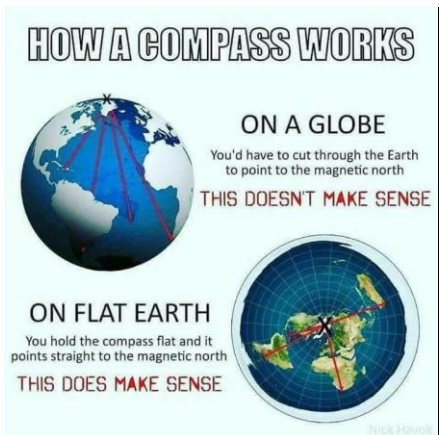


আরো বেশি জানতে চাইলে এখানে দেখতে পারেন।

## NORTH POLE, THE BADLANDS AND THE RED ROSE (UPDATED)

<http://rosettedelacroix.com/?p=5455>

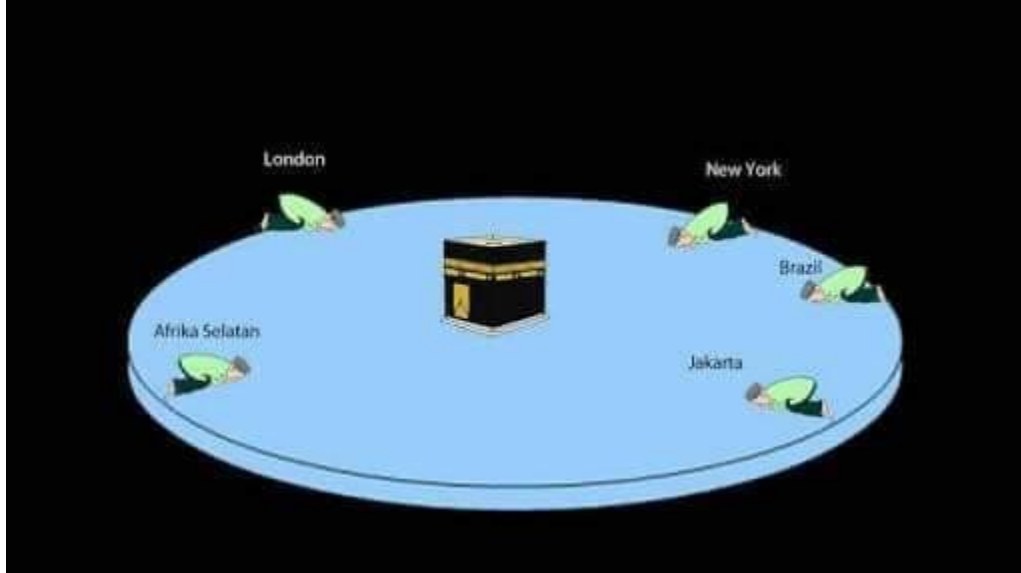
এখন আসুন দেখি, কম্পাস সমতলে বিছানো পৃথিবীতে কিভাবে কাজ করে? আসলে এই প্রশ্নটাই ভুল। বরং প্রশ্ন করতে হবে, কম্পাস বলাকার পৃথিবীতে কিভাবে কাজ করে? কারণ সমতল জমিনেই কম্পাস সঠিক ভাবে কাজ করতে পারবে। বল পৃথিবীতে নয়।



কথিত বলাকার পৃথিবীতে যারা নর্থ পোলার উল্টা দিকে আছে, তাদের কম্পাস সবসময় মাটির দিকে থাকবে। সুতরাং এখান থেকেও বুঝা যায় দুনিয়া সমতলে বিছানো। বলের মতো নয়।

## কম্পাস দ্বারা কেবলা নির্ণয়ের পদ্ধতি:

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন



নামায়ে কেবলামুখী হওয়া (তথা বাইতুল্লাহ মুখী বা কাবামুখী হওয়া) নামাযের অন্যতম প্রধান ফরয। যারা বাইতুল্লাহ দেখতে পাওয়া যায় এমন স্থানে নামায পড়েন তাদেরকে হুবহু বাইতুল্লাহ বা হুবহু কাবা শরীফ বরাবর মুখ করে নামায আদায় করতে হয়। এটাকে বলা যায় ‘আইনে কেবলা’ (একেবারে সোজা কেবলা)। তাদের জন্য সোজা কেবলামুখী-কাবামুখী হওয়া জরুরি। আর যেখান থেকে বাইতুল্লাহ দেখতে পাওয়া যায় না এমন কোনো স্থানে কেউ নামায পড়লে (চাই

বিশ্বের যেখানেই হোক না কেন) তার মুখ হুবহু বাইতুল্লাহ বরাবর না হলেও চলে, তবে বাইতুল্লাহর বা কেবলার দিকের মধ্যে থাকতে হবে। একে বলা হয় ‘জেহাতে কেবলা’। জেহাতে কেবলা অর্থ কেবলার দিক বা বাইতুল্লাহর দিক।

এই ‘কেবলার দিক’ বা ‘বাইতুল্লাহর দিক’ বলতে বোঝায় বাইতুল্লাহ যে বরাবর অবস্থিত তার থেকে ডান দিকে ৪৫ ডিগ্রী এবং বাম দিকে ৪৫ ডিগ্রী এই সর্বমোট ৯০ ডিগ্রী অঞ্চলকে। নামাযীকে অবশ্যই এই ৯০ ডিগ্রীর মধ্যে অভিমুখী থাকতে হবে। এর বাইরে অভিমুখী হয়ে গেলে নামায হবে না। কেননা পৃথিবীর বৃত্ত হচ্ছে ৩৬০ ডিগ্রী, আর মৌলিক দিক হচ্ছে ৪টি। অতএব একটা দিক বলতে বোঝায়  $(৩৬০ \div ৪ =)$  ৯০ ডিগ্রী অঞ্চলকে। সুতরাং কেবলার দিক বলতেও ৯০ ডিগ্রী অঞ্চলকেই বোঝাবে। তাই কাবা শরীফ বা বাইতুল্লাহ শরীফ যে বরাবর অবস্থিত (৩৯০ ৩৯' পূর্ব দ্রাঘিমা ও ২১০২৫' উত্তর অক্ষাংশ) তার থেকে ডান দিকে ৪৫ ডিগ্রী এবং বাম দিকে ৪৫ ডিগ্রী এই সর্বমোট ৯০ ডিগ্রীর মধ্যে রুখ (অভিমুখিতা) থাকলেও নামায হয়ে যাবে।

আমাদের দেশে যেসব মসজিদ রয়েছে তা নির্মাণের সময় অনেকেই কম্পাস ধরে হুবহু বরাবর কেবলা ঠিক রেখে মেহরাব তৈরি করেননি। বরং আশপাশের মসজিদ দেখেই কেবলা নির্ধারণ করে নিয়েছেন। এতে করে সেগুলোর অনেকটাতে হয়তো সোজা কেবলা রক্ষা হয়নি। তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে প্রায়শই দেখা যায় সেগুলোর কেবলা পূর্বোল্লিখিত ৯০ ডিগ্রীর মধ্যেই রয়েছে। অতএব এসব মসজিদে নামাযে কোনোই সমস্যা নেই। তবে কোনো মসজিদের কেবলা প্রকৃতই ৯০ ডিগ্রীর বাইরে থাকলে তা অবশ্যই সংশোধন করে নেয়া

চাই। কিন্তু ইদানিং মানুষের হাতে হাতে মোবাইল থাকে। আর অনেক মোবাইলে থাকে ডিজিটাল সাধারণ কম্পাস বা কেবলা কম্পাস। এ সুবাদে অনেকেই মোবাইলে সাধারণ কম্পাস বা কেবলা কম্পাস দেখে মসজিদের কেবলা সোজা বরাবর না পেলেই এবং একটু ডানে-বামে বাঁকানো থাকলেই হৈ চৈ শুরু করেন যে, এই মসজিদের কেবলা ঠিক নেই, এতে নামায হবে না।

এরূপ লোকদের অনেকেই সোজা কেবলার ডান দিকে ৪৫ ডিগ্রী এবং বাম দিকে ৪৫ ডিগ্রী -সর্বমোট এই ৯০ ডিগ্রীর মধ্যে মুখ থাকলেও নামায হয়ে যায়- এ মাসআলাটি জানেন না। তদুপরি শুধুমাত্র ইন্টারন্যাশনাল শিপে ব্যবহৃত জাইরো কম্পাস (Gyro compass) নন ম্যাগনেটিক হওয়ার কারণে ভূগর্ভস্থ চুম্বকের কারণে সে কম্পাস প্রভাবিত হয় না। ফলে তা উত্তরসহ অন্য সব দিক সঠিক প্রদর্শন করে। কিন্তু অন্য যেকোনো ধরনের কম্পাস (এনালগ হোক বা ডিজিটাল) ম্যাগনেটিক কম্পাস হওয়ার কারণে হুবহু দিক দেখায় না- এ বিষয়টাও জানা থাকা দরকার। তাহলেই সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হবে যে, সোজা কেবলা কোন্ দিকে এবং সংশ্লিষ্ট স্থানের অভিমুখিতা ৯০ ডিগ্রীর মধ্যে রয়েছে কি না।

এনালগ বা ডিজিটাল যে কম্পাসই হোক না কেন তা যে হুবহু দিক দেখায় না- এ বিষয়টা বোঝার জন্য জানতে হবে কম্পাসের মাধ্যমে প্রথমে উত্তর দিক নির্ণিত হয় এবং তা থেকে অবশিষ্ট দিকগুলো নির্ণিত হয়। আরও জানতে হবে উত্তর রয়েছে দুই ধরনের। একটি হল ভৌগোলিক উত্তর (Geographical North) তথা প্রকৃত উত্তর (যেদিকে উত্তর আকাশের ধ্রুব তারা অবস্থিত)। আর অপরটি হল চৌম্বক উত্তর (Magnetic North)। আর কম্পাস যে উত্তর প্রদর্শন

করে তা হচ্ছে চৌম্বক উত্তর। চৌম্বক উত্তর ও ভৌগোলিক উত্তর এক নয়। চৌম্বক উত্তর মেরু ও ভৌগোলিক উত্তর মেরুর অবস্থান এক জায়গাতে নয়। চৌম্বক উত্তর মেরু ভৌগোলিক উত্তর মেরু থেকে ডানে/বাঁয়ে অবস্থান করে।

চৌম্বক উত্তর স্থির থাকে না বরং কখনো ডানে কখনো বাঁয়ে সরে থাকে। যেমন : নিম্নে প্রদত্ত তালিকা থেকে বিভিন্ন সময়ে চৌম্বক উত্তরের অবস্থানে পার্থক্য হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হবে। বিভিন্ন সনে চৌম্বক উত্তরের অবস্থান ২০১৮- এর পর থেকে আবার উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করবে। (নেটে Magnetic North, geomagnetic and magnetic poles A\_ev Where is the magnetic north pole right now? শিরোনামে চৌম্বক উত্তরের এই স্থান পরিবর্তনের ডাটা দেখে নেয়া যেতে পারে।)

অতএব কম্পাস প্রদর্শিত উত্তর থেকে প্রকৃত উত্তর বের করতে হলে প্রথমে জানতে হবে চৌম্বক উত্তরের বর্তমান অবস্থান প্রকৃত উত্তর থেকে কত ডিগ্রী কোন্ দিকে রয়েছে। আমরা একটি চিত্র প্রদর্শন করেছি। চিত্রটি কম্পিউটারে যথাসাধ্য সুক্ষ্মভাবেই আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে। (চিত্রটি আল কাউসার ম্যাগাজিনে ছিল না। তাই এখানেও দেয়া গেলো না।) তাতে প্রমাণিত হয়েছে ২০১৮ সালে প্রকৃত উত্তর থেকে চৌম্বক উত্তর ২.৫০০ (দুই দশমিক পঞ্চাশ ডিগ্রী) বা ২০৩০' (দুই ডিগ্রী ত্রিশ মিনিট) পূর্বে অবস্থিত।

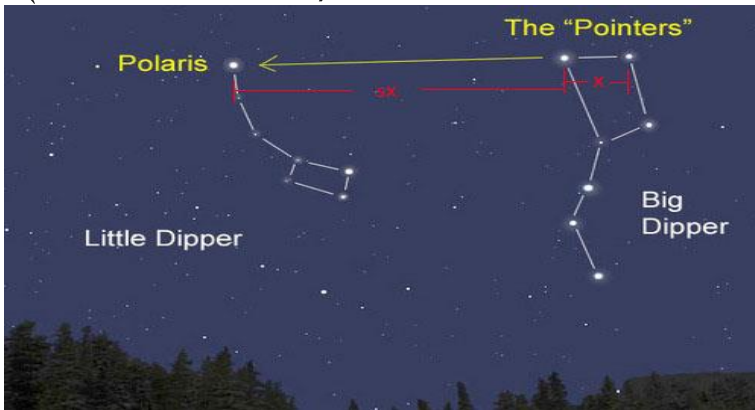
অতএব কম্পাস যে উত্তর দেখাবে তা থেকে এই পরিমাণ পশ্চিমে হবে প্রকৃত উত্তর। এই প্রকৃত উত্তরের ভিত্তিতে অন্যান্য দিক নির্ণীত হবে। তারপর যেখান থেকে কেবলার দিক বের করতে চাওয়া হবে সে জায়গার দ্রাঘিমা অক্ষ ও বায়তুল্লাহর দ্রাঘিমা অক্ষ নির্ণয় করে

বায়তুল্লাহ কত ডিগ্রী কোন্ দিকে অবস্থিত তা বের করতে হবে। আমাদের প্রদত্ত চিত্রের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ কত ডিগ্রী কোন্ দিকে অবস্থিত তা বের করা সহজ। চিত্রটি ঢাকার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এ চিত্রের আলোকে অন্য যে কেউ তার স্থানের জন্য চিত্র অংকন করে নিতে পারবেন। (তবে অবশ্যই চিত্র তৈরির কাজটি দক্ষ হাতে সম্পন্ন হতে হবে। বর্তমানে কম্পিউটারে মোটামুটি এরূপ নিখুঁত চিত্র তৈরি করা যায়।) প্রথমে একটি বৃত্ত আঁকুন। বৃত্তের পূর্ব পশ্চিমের মাঝে একটি দ্রাঘিমা রেখা টানুন। এটা হবে যে স্থান থেকে কেবলার দিক বের করতে চাওয়া হবে সে স্থানের দ্রাঘিমা। তারপর বায়তুল্লাহর দ্রাঘিমা রেখা (৩৯০৩৯' পূর্ব দ্রাঘিমা) টানুন। বায়তুল্লাহর অক্ষরেখা (২১০২৫' উত্তর অক্ষাংশ) টানুন। তারপর যে স্থান থেকে কেবলার দিক বের করতে চাওয়া হবে সে স্থানের দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখা টানুন।

পূর্বে বলা হয়েছে বৃত্তের পূর্ব পশ্চিমের মাঝে উত্তর দক্ষিণে যে রেখা হবে সেটা হবে সেই স্থানের দ্রাঘিমা রেখা। যেমন ঢাকা থেকে কেবলা বের করতে চাওয়া হলে ঢাকার দ্রাঘিমা ৯০০২৪' এবং অক্ষ ২৩০৪৮'। এভাবে ঢাকার দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখা টানুন। এবার বৃত্তের পূর্ব পশ্চিমের মাঝখানের রেখা তথা ঢাকার দ্রাঘিমা রেখা ঢাকার অক্ষরেখাকে যে স্থানে ক্রস করবে সেই ক্রসিং পয়েন্ট হল ঢাকার অবস্থান। এবার ঢাকার অক্ষরেখা বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে একটি সোজা রেখা টানুন। এটা হবে ঢাকা থেকে সোজা পূর্ব পশ্চিমের দিক বরাবর রেখা। সবশেষে ঢাকার অবস্থান থেকে একটি রেখা বায়তুল্লাহর অবস্থানকে (বায়তুল্লাহর দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখার ক্রসিং পয়েন্টকে) ক্রস করে বৃত্তের দিকে নিয়ে যান। এই রেখা বৃত্তের যেখানে গিয়ে মিলিত



হবে সেটা সোজা পশ্চিমের রেখা, যেখানে বৃত্তে মিলিত হয়েছে সেখান থেকে যতটুকু যদিকে সরে থাকবে সেই পরিমাণই হবে ঢাকা থেকে বায়তুল্লাহর অবস্থান- কোন্ দিকে কত ডিগ্রী সরে অবস্থিত তার নির্ণয়। নিম্নে এমন আমাদের প্রদত্ত চিত্রটি দেখুন (picture not found)। এতে দেখা যাচ্ছে বায়তুল্লাহ ঢাকা থেকে .৬০০ (দশমিক ৬০ ডিগ্রী) বা ৩৬' (৩৬ মিনিট) উত্তর দিকে অবস্থিত। এখানে উল্লেখ্য যে, কেউ মনে করতে পারেন বায়তুল্লাহর অবস্থান যখন ২১০২৫' উত্তর অক্ষাংশে আর ঢাকার অবস্থান ২৩০৪৮' অক্ষাংশে, তাহলে ঢাকা থেকে বায়তুল্লাহ ( ২৩০৪৮' - ২১০২৫' =) ২০২৩' (২ ডিগ্রী ২৩ মিনিট) দক্ষিণ দিকে হওয়ার কথা। এরূপ মনে করা ভুল। কারণ অক্ষরেখা সামনের দিকে ক্রমান্বয়ে মেরুর দিকে বেঁকে গিয়ে থাকে। সব অক্ষরেখাই যেকোনো স্থান থেকে আগে পিছের দিকে ক্রমান্বয়ে মেরুর দিকে বেঁকে যায়। আমাদের প্রদত্ত চিত্রেও বিষয়টি লক্ষ করা যাবে। পূর্বোক্ত বিষয়টা সামনে রেখে আমরা উদাহরণস্বরূপ ঢাকা থেকে সোজা কেবলার দিক নির্ণয় করার ৪টা পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করব। (ঢাকা ব্যতীত অন্যান্য স্থানের বিষয়টাও এর উপর ভিত্তি করে বুঝে নেয়া যাবে।)



১. ধ্রুবতারার সাহায্যে কেবলা নির্ণয় উত্তর আকাশের ধ্রুবতারা চিহ্নিত করুন। (সপ্তর্ষীম-লের সাহায্যে ধ্রুবতারা চিহ্নিত করা যায়।) ধ্রুবতারা প্রকৃত উত্তর দিকে অবস্থিত। এটা স্থির তারা, কখনও তার স্থান পরিবর্তন হয় না। অতএব ধ্রুবতারার দিক হচ্ছে প্রকৃত উত্তর দিক। এর ভিত্তিতে প্রকৃত পশ্চিম দিক নির্ণয় করুন। সেই পশ্চিম দিক থেকে .৯০০ (দশমিক ৯০ ডিগ্রী) বা ৫৪' (৫৪ মিনিট) উত্তরে সোজা কেবলার দিক।

২. এনালগ কম্পাসের সাহায্যে কেবলা নির্ণয় এনালগ কম্পাস দিয়ে প্রকৃত উত্তর বের করুন। উল্লেখ্য, সব কম্পাসই চৌম্বক উত্তর নির্ণয় করে থাকে প্রকৃত উত্তর নয় -যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি-। তাই কম্পাস প্রদর্শিত চৌম্বক উত্তর প্রকৃত উত্তর থেকে কত ডিগ্রী কোন্ দিকে অবস্থিত তা বের করুন। এটা বের করার পদ্ধতি হল চৌম্বক উত্তর কত দ্রাঘিমা ও অক্ষে অবস্থিত তা বের করুন। তারপর ঢাকার (অর্থাৎ যেখান থেকে দিক নির্ণয় করতে চান এবং যে স্থানটিকে চিত্রে বৃত্তের দ্রাঘিমা [মধ্যরেখা] ও অক্ষের ক্রসিং পয়েন্টে চিহ্নিত করেছেন।) অবস্থান থেকে একটি রেখা উক্ত চৌম্বক উত্তরের দ্রাঘিমা ও অক্ষের ক্রসিং পয়েন্ট ভেদ করে বৃত্তে নিয়ে সংযুক্ত করুন। তারপর প্রকৃত উত্তর থেকে এই সংযুক্তির পয়েন্টের দূরত্ব মাপুন। সেটাই হবে প্রকৃত উত্তর থেকে চৌম্বক উত্তরের দূরত্ব।

পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী ২০১৮ সালে চৌম্বক উত্তরের অবস্থান হচ্ছে ৮৬.৫০ উত্তর অক্ষাংশ এবং ১৭৮.৮০ পশ্চিম দ্রাঘিমা। এবার উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী আঁকা আমাদের প্রদত্ত চিত্রে দেখুন ২০১৮ সালে প্রকৃত উত্তর থেকে চৌম্বক উত্তরের ব্যবধান হয় ২.৫০০ (দুই দশমিক পঞ্চাশ ডিগ্রী) বা ২০৩০' (দুই ডিগ্রী ত্রিশ মিনিট)। অতএব

কম্পাস প্রদর্শিত উত্তর থেকে ২.৫০০ পশ্চিমে হবে প্রকৃত উত্তর। এর ভিত্তিতে প্রকৃত পশ্চিম নির্ণয় করুন। সেই পশ্চিম দিক থেকে .৯০০ (দশমিক ৯০ ডিগ্রী) বা ৫৪' (৫৪ মিনিট) উত্তরে সোজা কেবলার দিক। (উল্লেখ্য, যেকোনো কম্পাস ব্যবহারের সময় কম্পাসের অবস্থানের আশেপাশে যেন লোহা জাতীয় কোনো কিছু না থাকে। কেননা তাতে কম্পাস প্রভাবিত হবে।) অথবা কম্পাস যে পশ্চিম দেখাবে তা যেহেতু প্রকৃত পশ্চিম থেকে ২.৫০০ উত্তরে। তাই কম্পাস প্রদর্শিত পশ্চিম থেকে ১.৬০০ ( $২.৫০০ - .৯০০ = ১.৬০০$ ) পরিমাণ দক্ষিণে হবে সোজা কেবলা।

৩. ডিজিটাল সাধারণ কম্পাসের সাহায্যে কেবলা নির্ণয় ডিজিটাল সাধারণ কম্পাস দিয়ে কেবলা বের করতে চাইলে এনালগ কম্পাস দিয়ে কেবলা বের করার যে পদ্ধতি পূর্বে বলা হয়েছে তা অনুসরণ করতে হবে।

৪. ডিজিটাল কেবলা কম্পাসের সাহায্যে কেবলা নির্ণয় ডিজিটাল কেবলা কম্পাস দিয়ে কেবলা নির্ধারণ করতে হলে জানতে হবে ডিজিটাল কেবলা কম্পাস কেবলা দেখায় ২৭৭.৬৭০। কোনো কোনোটায় দেখায় ২৭৭.৬৮০। কোনো কোনোটায় দেখায় ২৭৮০। এটা বুঝতে হলে আগে কম্পাসের ডিগ্রী বুঝতে হবে। কম্পাসে মোট ৩৬০ ডিগ্রী থাকে। উত্তরদিকে থাকে ০ ডিগ্রী। পূর্বদিকে থাকে ৯০ ডিগ্রী। দক্ষিণে ১৮০ ডিগ্রী। পশ্চিমে ২৭০ ডিগ্রী। অতএব যেকোনো স্থানে কম্পাস ধরলে ২৭০ ডিগ্রী (কম্পাসের) হল সেই স্থানের প্রকৃত পশ্চিম। আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ঢাকার সোজা কেবলা হচ্ছে প্রকৃত পশ্চিম থেকে . ৯০০ (দশমিক ৯০ ডিগ্রী) বা ৫৪' (৫৪ মিনিট) উত্তরে। অতএব কেবলা কম্পাস যখন ২৭৭.৬৭ ডিগ্রীকে কেবলা

দেখাচ্ছে তার অর্থ হল কম্পাসের পশ্চিম থেকে ৭.৬৭ ডিগ্রী উত্তরে কেবলা দেখাচ্ছে। আর কম্পাসের পশ্চিম যেহেতু প্রকৃত পশ্চিম থেকে ২.৫০০ (দুই দশমিক পঞ্চাশ ডিগ্রী) বা ২০৩০' (দুই ডিগ্রী ত্রিশ মিনিট) উত্তরে, তাহলে সারকথা এই দাঁড়াল যে, কেবলা কম্পাস প্রকৃত পশ্চিম থেকে  $(৭.৬৭+২.৫০-.৯০=)$  ৯.২৭ ডিগ্রী উত্তরে কেবলা দেখাচ্ছে। তাই কেবলা কম্পাস যে কেবলা দেখায় তার থেকে ৯.২৭ ডিগ্রী দক্ষিণে হবে প্রকৃত সোজা কেবলা। উল্লেখ্য, এক ধরনের কেবলা ডিরেকশন (Qibla direction) এ্যাপ রয়েছে, তাতে কেবলার দিকে সোজা রেখা টেনে দেখানো হয়। তাতেও ২৭৭.৬৭ ডিগ্রীর দিকে কেবলা দেখানো হয়ে থাকে।

আরও উল্লেখ্য, কেবলা নির্ণয়ের উপরোক্ত পদ্ধতি চতুষ্টিয়ের মধ্যে ১ম পদ্ধতিই সবচেয়ে উত্তম। তারপর ২য় পদ্ধতি তথা এনালগ কম্পাসের সাহায্যে কেবলা নির্ণয়ের পদ্ধতি। ডিজিটাল কম্পাসের সেন্সর অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হয়ে থাকে বিধায় সামান্য অসমতল অবস্থানে রাখলে বা ধরার মধ্যে সামান্য উনিশ বিশ হলে কিংবা আরও বিবিধ কারণে রেজাল্ট পাল্টে যায়। এনালগ কম্পাসে তেমনটা হয় না। সবশেষে আর একটি বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করে প্রবন্ধটি শেষ করছি।

তা হল, কোনো মসজিদের কেবলার রুখ মূল সোজা কেবলা থেকে ৪৫ ডিগ্রী ডানে বা ৪৫ ডিগ্রী বামের মধ্যে থাকলেও নামায হয়ে যায়-কথাটি যেন সর্বদা স্মরণে রাখা হয়। আমাদের এতক্ষণের আলোচনার উদ্দেশ্য হল কোনো মসজিদের কেবলা এর বাইরে থাকলে তারা সংশোধন করে নিবেন, কিংবা নতুনভাবে কোথাও মসজিদ নির্মাণ

করতে চাইলে বা কোনো স্থানের কেবলার দিক সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে চাইলে এই পদ্ধতিগুলোর সহযোগিতা নিতে পারবেন।

<https://www.alkawsar.com/bn/article/2105/>

### **স্যাটানিস্ট নিউটন ও তার কথিত গ্রাভিটির ব্যবচ্ছেদ:**

#### **গ্রাভিটি'র যাদুবৈজ্ঞানিক শিকড় এবং তার শিরচ্ছেদ.....**

গ্রাভিটি হলো কুফরী হেলিওসেন্ট্রিজম কাল্টের প্রাণ। এই গ্রাভিটিই গ্লোব আর্থকে টিকিয়ে রেখেছে।

জুডিও-ব্যাবিলনিয়ান যাদুবিজ্ঞানের শিষ্য যাদুকর পিথাগোরাস ঐতিহাসিকভাবে হেলিওসেন্ট্রিজম কাল্টের সূচনা করে। সেই তার মিস্ট্রি স্কুলের শিষ্যদের মাঝে গোলক জমীনের ধারণা প্রতিষ্ঠা করে যায়। কিন্তু গ্লোব গ্রাভিটি ছাড়া অচল। এজন্য যাদুবিজ্ঞানীদের কাছে গ্রাভিটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যযুগের হামেটিস্ট যাদুবিজ্ঞানীদের কাছে গ্রাভিটির নাম ছিল ম্যাগনেটিজম, অ্যাফিনিটি, অ্যাট্রাকশন। অ্যারিস্টটলের মতো মিস্টিক্সরা গ্রাভিটির ব্যাপারে ইশারা দিয়ে দিয়েছিল।

"In the 4th century BC, the Greek philosopher Aristotle believed that there is no effect or motion

without a cause. The cause of the downward motion of heavy bodies, such as the element earth, was related to their nature, which caused them to move downward toward the center of the universe, which was their natural place. Conversely, light bodies such as the element fire, move by their nature upward toward the inner surface of the sphere of the Moon. Thus in Aristotle's system heavy bodies are not attracted to the Earth by an external force of gravity, but tend toward the center of the universe because of an inner gravitas or heaviness.” (উইকি)

এমনকি ইস্টার্ন মিস্টিসিজমের অনুসারী আর্যভট্ট মনে করতো পৃথিবী

**গতিশীল।** তাহলে আমরা কেন ছিটকে যাই না তা ব্যাখ্যার জন্য গ্রাভিটির মতো একটি শক্তির সংজ্ঞা প্রদান করে।

“.....Aryabhata first identified the force to explain why objects do not spin out when the Earth rotates,.....”  
(উইকি)

ব্রহ্মগুপ্তের মতো মালাউনও গ্রাভিটি সম্পর্কিত ব্যাপারে বলে গিয়েছে। “ Indian astronomer and mathematician Brahmagupta



described gravity as an attractive force and used the term "gurutvākarṣaṇam (गुरुत्वाकर्षणम्)" for gravity."

(উইকি)

এদের জীবনী পড়লেই আপনারা বুঝতে পারবেন তারা কতোটা অকাল্ট প্র্যাক্টিসে ডুবে ছিল। এদের সাড়া জীবনটাই চলে গিয়েছে শয়তানি কুফরী মেটাফিজিক্সের উন্নয়ন সাধন করতে, প্যাগান মেটাফিজিক্যাল ডক্ট্রিনকে ডিকোড করে ম্যাথম্যাটিক্যাল ফর্মে রূপ দিতে। এটা আশা করি আপনারা একটু খোজাখুজি করলেই বুঝতে পারবেন। এজন্য আর কষ্ট করে ডকুমেন্ট নিয়ে আসছি না।

গ্রিক ফিলোসফি আরবে প্রবেশ করাতে হাজার বছরের প্রতিষ্ঠিত জিওসেন্ট্রিক কসমোলজি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। মানুষের মাঝে প্রশ্ন ঘুরতে থাকে পৃথিবীর আকার নিয়ে। পরে কিছু অভিযাত্রীক জমীনের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে বলতে থাকে পৃথিবী আসলে গোল। ব্যাপারটা অদ্ভুত। একই সাথে অত্যন্ত বায়াসড। কারণ মেইনস্ট্রিম ফ্ল্যাট আর্থ ম্যাপ অনুযায়ী তা আসলে নর্থপোলকে কেন্দ্র করে ঘোরা। এটা মোটেই গ্লোব আর্থকে প্রমাণিত করে না।

তারপর আরবদের হাতে গড়ে ওঠা সুডোসাইন্স ইউরোপে প্রবেশ করে। এতে সেখানে জন্ম হয় সাইন্টিজমের দেবতা লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, গ্যালিলিও, কেপলার,

নিউটন প্রমুখদের।

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি অন্যান্য মিস্টিক্সদের থেকে ব্যতিক্রম। তাকে এখনকার বিজ্ঞানীদের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কারণ সে তার যাদুচর্চাকে শুধু ফিলোসফিক্যাল ব্যাপারগুলোতেই সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং যাদুবিজ্ঞানের প্রিন্সিপল মেনে টেকনোলজি উদ্ভাবনের মতো এক ঐতিহাসিক কাজ করেছিল। ভিঞ্চিই মেকানিক্যাল নলেজ আর ফিলোসফিক্যাল নলেজের সমন্বয় করে। মেশিনের মেকানিজমকে অকাল্ট ফিলোসফিক্যাল ওয়ার্ল্ডভিউতে ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু করে। এটা মিস্টিক্সদের জন্য নিঃসন্দেহে এক নতুন অধ্যায়। এবং সেই প্রচেষ্টা এখনও চালু আছে।

এই ভিঞ্চিও গ্রাভিটির ধারণা দিয়ে গিয়েছে। বরং সে সর্সারির ফোর এলিমেন্টসের পর গ্রাভিটিকেও যুক্ত করেছে।

“Leonardo da Vinci describes kinetic energy as the "mother and origin of gravity." He describes two pairs of physical powers, all stemming from a metaphysical origin, which have an effect on everything: abundance of force and motion, and gravity and resistance. He associates gravity with the 'cold' classical elements, water (wet) and earth (dry), calling its energy infinite.” (উইকি)

এবং সবশেষে নিউটন এসে গ্রাভিটি থিওরীর জন্ম দেয়।

জানেন এই নিউটন কে ছিল?

সে সারা জীবন যাদুবিজ্ঞানে ডুব দিয়ে কাটিয়েছে।

সে আলকেমিতেও এক্সপার্ট ছিল। "English physicist and mathematician Isaac Newton produced many works that would now be classified as occult studies. These works explored chronology, alchemy, and Biblical interpretation (especially of the Apocalypse)" (উইকি)

"so many of his experimental studies used esoteric language and vague terminology more typically associated with alchemy and occultism." (উইকি)

"Much of what are known as Isaac Newton's occult studies can largely be attributed to his study of alchemy." (উইকি)

এমনকি তার প্রিন্সিপিয়া অফ ম্যাথমেটিকাও বিভিন্ন অকাল্ট নলেজ থেকে লিখিত।

"Many of the discoveries and mathematical formula found within Newton's Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica can be linked, often very

directly, to his occult and alchemical studies.”(উইকি)

আরেকটি ব্যাপার হলো, নিউটন বিভিন্ন সিক্রেট সোসাইটির সাথে যুক্ত ছিল।

“Isaac Newton has often been associated with various secret societies ...”(উইকি)

এমনকি সম্ভবত সে ৩৩ডিগ্রি ফ্রিমেসন ছিল। কেননা অনেক ম্যাসনিক স্থাপনা তার নামে উৎসর্গকৃত। Lodge of England নামক ম্যাসনিক অর্গানাইজেশনের একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিল এই মালাউন নিউটন।

“ Isaac Newton is believed to have been a 33-degree Scottish RiteFreemason since he was one of the 1717 founders of the Lodge of England,[33] and by virtue of the number of masonic buildings have been dedicated in his honour.”(উইকি)

নিউটনের সাথে রোজাক্রুশানিজমেরও সম্পর্ক ছিল। রোজাক্রুশানিজম আসলে সেসকল বানী ইসরাইলের লোকদেরই বিশ্বাস যারা কাব্বালাহসহ বেশ কিছু যাদুবিজ্ঞানকে দ্বীন হিসেবে নিয়েছিল।

“Perhaps the movement which most influenced Isaac Newton was Rosicrucianism.”(উইকি)

শয়তানের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে নিউটনের সম্পর্ক দেখুন, “The Rosicrucian belief in being specially chosen for the ability to communicate with angels or spirits is

echoed in Newton's prophetic beliefs.”(উইকি)

নিউটনের কিছু বই যেন রোজাক্রুশানিজমের কিতাবেরই ইংলিশ অনুবাদ।

“Newton left behind a heavily annotated personal copy of The Fame and Confession of the Fraternity R.C., by Thomas Vaughan which represents an English translation of The Rosicrucian Manifestos.”(উইকি)

রোজাক্রুশানিস্টরা নিউটনকে তাদের ভাই মনে করতো। ” The Ancient & Mystical Order Rosae Crucis has always claimed Newton as a frater.”(উইকি)

এমনকি তাকে রোজাক্রুশানিজমের সদস্য ভাবা হতো তার জীবদ্দশাতেই। ”

During his own life, Newton was openly 'accused' of being a Rosicrucian, as were many members of The Royal Society.”(উইকি)

নিউটন ছিল রোজাক্রুশানিজমের ভক্ত। সে তার বইতেও তাদের আকিদা আর

বক্তব্য শেয়ার করেছে। ”from his writings it does appear that he may have shared many of their sentiments and beliefs.”(উইকি)

নিউটন আবার পিথাগোরাসেরও ফ্যান ছিল।

তো এই হচ্ছে নিউটন। বিজ্ঞানী। তার মতো অভিশপ্তের হাতেই রিভাইভ্যাল হয়  
গ্রাভিটির।



গ্লোবের কথা বললে একটি প্রশ্ন এসে যায়, তা হলো পৃথিবী যদি আসলে বলের  
মতো হয় তবে সমুদ্রের পানি, আমরা, পশুপাখি ইত্যাদি কিভাবে জমীনের সাথে  
লেগে থাকে?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যই জন্ম হয় গ্রাভিটির। আসলে একটি মিথ্যা কথা  
বললে সেটা সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখতে গেলে আরো মিথ্যার জন্ম দিতে হয়।  
এ কারণেই গ্লোবের মতো মিথ্যাকে বাচাতে গিয়ে আরো একটি মিথ্যার সূত্রপাত  
হয়। এবং এই গ্রাভিটিই হয় হেলিওসেন্ট্রিজম কাল্টের জীবন। কারণ গ্রাভিটি  
মিথ্যা প্রমাণিত হলে গ্লোব মিথ্যা, সূর্যকে প্রদক্ষিণ করা মিথ্যা, গ্যালাক্সি মিথ্যা,  
ক্লাস্টার মিথ্যা, সুপার ক্লাস্টার মিথ্যা, বিগ ব্যাং মিথ্যা, ইভল্যুশন  
মিথ্যা..... চেইন রিঅ্যাকশন....



অর্থাৎ আমরা যদি গ্রাভিটিকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে পারি তাহলে  
হেলিওসেন্ট্রিজমের খেলা শেষ।

এখন আমরা স্টেপ বাই স্টেপ গ্রাভিটিকে মিথ্যা থিওরী প্রমাণ করবো  
ইনশাআল্লাহ।

১/ আমরা ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছি যে ভূপৃষ্ঠ থেকে যতো উচ্চতাতেই আমরা উঠি  
না কেন, আমরা কোনো কার্ভেচারের দেখা পাই না। যদিও বর্তমান কার্ভেচারের  
হিসাব অনুযায়ী দেখা পাওয়ার কথা।

দেখুন হাই অ্যালটিটিউড বেলুনের ভিডিও-

<https://youtu.be/CcqF6s-1QEM>

[https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=1848916595366541&id=1685985511659651](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1848916595366541&id=1685985511659651)

এখন যদি পৃথিবীর কার্ভেচার না দেখা পাওয়াকে হেলিওসেন্ট্রিক কাল্ট অনুযায়ী  
ব্যাখ্যা করতে চাই তাহলে এই একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়-

(ক) গোল পৃথিবীর আকার আসলে আরো বড়। এ কারণে আমরা কার্ভ দেখি না।

আর কিছু বলার আছে কিনা আমার জানা নেই। যদি আমরা এই পয়েন্টটিকে সঠিক  
বলে ধরে নেই তাহলে যেসব ব্যাপারগুলো আসে-

- পৃথিবীর আকার ধরে যেসব ফর্মুলা ও হিসাব নিকাশ এতোদিন যা করা হতো তা সব ভুল। এখন তা নতুন করে সাজাতে হবে।
- পৃথিবীর অভিকর্ষজ ত্বরণের মান বাড়াতে হবে। কারণ আরো বড় পৃথিবী মানে আরো বেশি আকর্ষণ।
- এতোদিন নাসার মতো সকল স্পেস এজেন্সি যারা তাদের ছবি বা ভিডিওতে যে পরিমাণ কার্ভেচার দেখানো হয়েছে তা সব ভুল ও মিথ্যা।
- পৃথিবী বড় হওয়ার কারণে চাঁদের কক্ষপথ, পৃথিবীর কক্ষপথ, স্যাটেলাইটের কক্ষপথ সংক্রান্ত সকল ম্যাথম্যাটিক্যাল ক্যালকুলেশন চেঞ্জ করতে হবে।
- জোয়ারভাটার কথিত কারণও মডিফাই করতে হবে।

ইত্যাদি ইত্যাদি।

বুঝতেই পারছেন রাতারাতি এতো কিছু পরিবর্তন করা সম্ভব না। আমরা যেহেতু কার্ভেচারের দেখা পাচ্ছি না, সেহেতু এই ঘটনা-

- গ্রাভিটি সংক্রান্ত সকল ম্যাথম্যাটিক্যাল ক্যালকুলেশনকে হোক্স প্রমাণ করে।
- গোটা গ্রাভিটিকেই হোক্স প্রমাণ করে। আমরা যেহেতু প্রমাণ করেছি পৃথিবী সমতল, তারমানে গ্রাভিটিও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কারণ গ্রাভিটি যদি থাকতো, তবে সমতল হতে পারতো না।

- গ্রাভিটি শেষ মানে গোটা হেলিওসেন্ট্রিজম কাল্ট শেষ।

**প্রমাণিত- গ্রাভিটি একটি হোক্স।**

২/ ওয়াটার লেভেল সবসময় প্লেইন থাকে। সেটা হোক পুকুর, খাল, নদী, কিংবা সমুদ্র। অথচ হিসাব মতে প্রতি ১০ মাইলে প্রায় ৬৬ ফুট পানি কার্ভ করার কথা। আর এই হিসাবে গ্রাভিটির ভূমিকা আছে। কিন্তু বাস্তবে ৬৬ফুট কেন, ১ফুটও পানি কার্ভ করে না।

দেখুন সাধারণ পাবলিকের এক্সপেরিমেন্ট-

<https://m.facebook.com/groups/315165405515447?view=permalink&id=738524789846171>

পৃথিবীকে গোল রেখে এখন এ ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে হলে ১(ক)এর দিকেই

যেতে হবে। কিন্তু তা সম্ভব নয়।

এ থেকে প্রতীয়মান হয়-

- গ্রাভিটির সকল হিসাব হোক্স। কারণ, বিজ্ঞানীদের কথা অনুযায়ী যদি গ্রাভিটি থাকতো তবে পানি কার্ভ করতো। কিন্তু বাস্তবে পানি কার্ভ করে না।

- গ্রাভিটি শেষ তো হেলিওসেন্ট্রিজম কাল্টই শেষ।

**প্রমাণিত- গ্রাভিটি হোক্স।**

৩/ আমরা দেখি প্রায় ওজনহীন ধূলিকণা বাতাসে ভেসে বেড়ায়। তাদের ওপর যেন কথিত গ্রাভিটির কোনো প্রভাবই নেই। অথচ বলা হয় এইসব কোটি কোটি ধূলিকণা নিয়ে গঠিত অ্যাটমোস্ফিয়ারকে গ্রাভিটি ধরে রাখে। এমনকি স্পেসের ভ্যাকুয়ামও নাকি বাতাসকে টানতে পারে না, গ্রাভিটি এতোটাই পাওয়ারফুল! অথচ আমরা দেখি ধূলিকণা গ্রাভিটির প্রভাবহীন।

৪/ গ্রাভিটি সমুদ্রের পানিকে আটকিয়ে রাখার সামর্থ্য রাখে কিন্তু ছোট্ট মশাকে আটকিয়ে রাখতে পারে না। ছোট্ট পিচ্চি মশা কিন্তু গোটা পৃথিবীর সেই শক্তিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে উড়ে বেড়ায় যে শক্তি গোটা সমুদ্রকে আটকিয়ে রাখতে পারে।

এখন হয়তো আপনারা বলতে পারেন যে মশার সাথে পৃথিবী অভিকর্ষ কম এ কারণে উড়তে পারে। এটাই হচ্ছে ফাদ যেটায় আপনারা পতিত হলেন।

আপনাদের ভাষ্য অনুযায়ী মশা পাখা ঝাপটিয়ে গ্রাভিটির বিরুদ্ধে শক্তি অর্জন করে। তাহলে প্রশ্ন এসে যায় সে যদি সামান্য পাখা ঝাপটিয়েই উড়তে পারে তবে তার মোমেন্টাম অনুযায়ী তো তার মহাকাশে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে কী তা হয়?

মশার ভর,  $m=0.1\text{g}$

মশার বেগ,  $v=30000\text{m/s}$  [মশা যখন পৃথিবীর সাপেক্ষে স্থির, আপনাদের হিসাব মতে পৃথিবী তখনও গতিশীল]

মশার ভরবেগ,  $P=0.1 \times 30000=3000\text{kgm/s}$

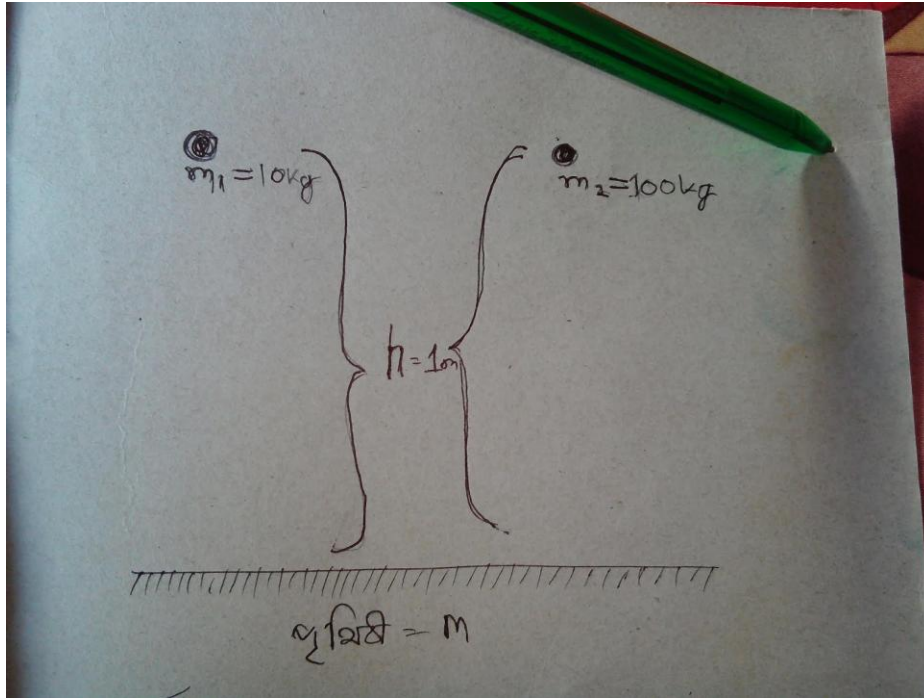
পাখা ঝাপটিয়েই যদি কথিত গ্রাভিটির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়, তাহলে মশার ভরবেগ অনুযায়ী মশার তো মহাকাশে চলে যাওয়ার কথা।

৫/ মনে করুন দুটি বস্তু  $m_1$  ও  $m_2$ ।  $m_1$  এর ভর ১০কেজি,  $m_2$  এর ভর

১০০ কেজি। ধরলাম পৃথিবীর ভর  $M$ । উভয়েই ভূপৃষ্ঠ থেকে  $h=1$  মিটার

উচ্চতায় অবস্থান করছে। এখন জমীনের দিকে কার কথিত আকর্ষণ বেশি হবে?

$F_1$  নাকি  $F_2$ ?



$$F_1 = (GMm_1)/d^2 = 10GM$$

আবার,

$$F_2 = (GMm_2)/d^2 = 100GM$$



এখানে  $G$ ,  $M$  এবং  $10$ ,  $100$  কনস্ট্যান্ট। সুতরাং,  $100GM$  বড়  $10GM$  থেকে।

অর্থাৎ,  $F_2 > F_1$

কিন্তু আমরা দেখি যে, গ্যালিলিওর  $h = ut \pm \frac{1}{2}gt^2$  সূত্র মেনে সব সমত্বরণে পড়ে। অর্থাৎ এখানে আকর্ষণ থাকুক বা না থাকুক, পতনের ব্যাপারটা একই!

৬/ এক ফোটা বৃষ্টির পানি জমীনে আপতিত হয়। অথচ এর থেকেও ভারী মেঘমালা আল্লাহর ইচ্ছাতে আকাশে ভেসে বেড়ায়। তাহলে গ্র্যাভিটির খেলাটা কোথায়?

৭/ পৃথিবী নাকি গতিশীল। পৃথিবীর গড় গতি সেকেন্ডে  $৩০$  কি.মি.। ঘন্টায়  $১,০৮,০০০$  কি.মি.। মানে  $১০৮০০০০০০$  মিটার পার ঘন্টা। মনে করুন আমার ভর

$৬০$  কেজি। মোমেন্টামের সূত্র হলো  $P = mv$

আমার ভর,  $m = ৬০$  কেজি

আমার বেগ,  $v = ৩০ \times ১০০০ = ৩০০০০$  m/s

তাহলে আমার ভরবেগ,  $P = ৬০ \times ৩০০০ = ১৮০০০০$  kgm/s

$১৮০০০০$  kgm/s এতো বড় মোমেন্টাম সত্ত্বেও আমি কেন ছিটকে যাই না? যেখানে সামান্য মশা মাছি ধুলা কথিত গ্র্যাভিটিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে উড়ে বেড়ায় সেখানে আমি এতো ভরবেগ নিয়েও কেন ছিটকে যাই না? আবার বলবেন

না যে মশার চেয়ে আমার ভর বেশি এজন্য ছিটকাই না। আমার সাথে পৃথিবী যে কথিত  $F$  সেটার থেকে  $P$  অনেক বড় ও শক্তিশালী। এছাড়াও যদি একটা গ্লাসকে দড়ি দিয়ে বেধে পানি ভরে জমীনের সাথে ভাটিক্যালি বৃত্তাকারে ঘুরানো হয় তবে পানি নিচে পড়ে না মোমেন্টামের কারণে। একটি পানির গ্লাসে যদি ৩০০গ্রাম পানি থাকে, আর দ্রুতি যদি হয় ১০কি.মি., তাহলে আমার কথিত মোমেন্টামের থেকেও তার মোমেন্টাম কম। অথচ সে ঠিকই গ্রাভিটিকে না মেনে গ্লাসে আটকিয়ে থাকে। সুতরাং এতো মোমেন্টাম নিয়েও কেন আমি ছিটকাই না? এরকম আরো অনেকভাবে গ্রাভিটিকে মিথ্যা প্রমাণ করা যায়।

গ্রাভিটিকে অস্বীকার করলে আমাদের প্রতি বেশ কিছু প্রশ্নের তীর ছুটে আসে।

যেমন গ্রাভিটি না থাকলে সবাই জমীনের দিকে আসে কেন?

এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে-

**(ক)** সবসময় সবকিছুর ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারবো এমনটা নয়। কোনো কিছুর উত্তম ব্যাখ্যা দিতে না পারার মানে এই না যে অন্য কোনো মিথ্যা ব্যাখ্যাকে মেনে নিতে হবে।

**(খ)** সবকিছু সম্পর্কে যে সবকিছু জানা থাকবে ব্যাপারটা এরকম নয়। আমাদের জানা বা না জানা বাস্তবতায় কোনো প্রভাব ফেলে না। মনে করুন একটি টিনের কৌটার মুখ বন্ধ। এখন তার ভিতরে কোনো মেটালের টুং টুং আওয়াজ আসে।

এখন একজন বললো টিনের কৌটার ভিতরে মেটাল বস্তু আছে। কিন্তু কেউ যদি বলে যে মেটালের রং না জানা পর্যন্ত আমরা এ কথা মানি না যে সেখানে কিছু আছে। তাহলে কি এটা ঠিক হবে? বস্তুত, আমরা তার রং জানি আর না জানি তাতে মেটালের কিছু যায় আসে না। মেটাল মেটালের জায়গাতেই থাকবে। ফ্ল্যাট আর্থের ব্যাপারগুলোও এরকম।

(গ) আমরা কুরআন সূরাহ থেকে জানতে চেষ্টা করি। কুরআন সূরাহয় না পেলে মনগড়া কোনো থিওরী দিই না।

---

তাহলে প্রশ্ন হলো সবকিছু জমীনের দিকে যায় কেন?

সবকিছু জমীনের দিকে যায় কারণ আল্লাহ এভাবেই সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন। যদি একাধিক ঘনত্ববিশিষ্ট বস্তু একসাথে থাকে তবে অধিক ঘনত্ববিশিষ্ট বস্তু কম ঘনত্ববিশিষ্ট বস্তু হতে বেশি জমীনের নিকটে থাকে।

আল্লাহ জমীনকে ধারক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। জমীন হলো আমাদের বাহক।

### **Surah Al-Mursalat, Verse 25:**

كَفَاتَا الْأَرْضَ عَلَىٰ جَنِّ الْمَ

আমি কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারিণীরূপে,

উক্ত আয়াতের তাফসীরে হাফেজ ইবনু কাসীর বলেন-

“....আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা’আলা বলেনঃ আমি জমীনের ওপর কি এই খিদমত অর্পণ করিনি যে, সে তোমাদের জীবিতাবস্থায় তোমাদেরকে স্বীয়

পৃষ্ঠে বহন করছে এবং তোমাদের মৃত্যুর পরেও তোমাদেরকে নিজের পেটের মধ্যে লুকিয়ে রাখছে? তারপর জমীন যেন হেলা-দোলা না করতে পারে তজ্জন্যে আমি ওতে সুউচ্চ পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তোমাদেরকে দিয়েছি মেঘ হতে বর্ষিত পানি এবং ঝর্ণা হতে প্রবাহিত সুপেয় পানি। এসব নিয়ামতপ্রাপ্তির পরেও যদি তোমরা আমার কথাকে অবিশ্বাস করো তবে জেনে রাখো যে, এমন এক সময় আসছে যখন তোমরা দুঃখ ও আফসোস করবে, কিন্তু তখন তা কোনোই কাজে আসবে না!” (তাফসীর ইবনে কাসীর, ১৭তম খণ্ড, ৭৮৭পৃষ্ঠা)

বস্তুতঃ আল্লাহ তা’আলা পৃথিবীকে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীকে সমতল ও বিস্তৃত করা, তাতে পানির ব্যবস্থা করা, পানিকে বায়োস্পি ধর্ম দিয়ে তার বুক চিড়ে পাহাড় সদৃশ জাহাজের চলার ব্যবস্থা করা, নিয়মিত পরিমিত পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করা, পর্বতকে গেড়ে দেওয়া, জন্তুজানোয়ারকে ছড়িয়ে দেওয়া, আকাশকে দুর্ভেদ্য ছাদ করা, রাতদিনের সুন্দর নিয়মে আবর্তন, চন্দ্র-সূর্যের ব্যবস্থা করা, নক্ষত্রের মাধ্যমে পথ চেনার ব্যবস্থা করা, মানুষের জন্য ফলমূল দিয়ে রিজকের ব্যবস্থা করা- এসবের মাঝে আল্লাহর নিদর্শন রয়েছে। আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মাঝে একটি হলো সবকিছুকে জমীনের নিকটে থাকার প্রবণতা দিয়ে সৃষ্টি করা। যেটাকে বিকৃত করে গ্রাভিটি নাম দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহই সর্বোত্তম জানেন।

---

এই গ্রাভিটিকে হোক্স প্রমাণ করাতে এক সাথে অনেক কিছুই মৃত্যু হয়ে গিয়েছে। যেমন- গ্লোব আর্থ, হেলিওসেন্ট্রিজম কাল্ট, বিগব্যাং, ইভল্যুশন ইত্যাদি। আসলে শয়তান একটা মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠার জন্য হাজারো মিথ্যার জন্ম দিতে পারে। এক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে।

### মধ্যাকর্ষণ শক্তির অযৌক্তিকতা

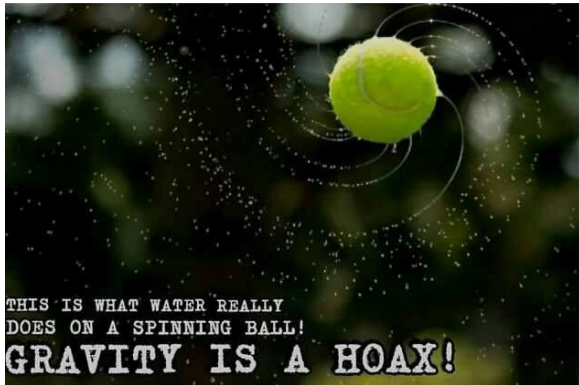
সবাই জানেন আপেলের পতন নিউটন সাহেব কে ভাবায়( যদিও এখন মাথায় আপেল পড়ার কথা অস্বীকার করা হয়) এবং তাকে নতুন থিওরির দিশা দেয় যে উহা গ্রাভিটির টানে মাটিতে পড়েছে। অর্থাৎ গ্রাভিটি একটি চুম্বকীয় শক্তির ন্যায় শক্তি যা থিওরি অনুযায়ী সবকিছুকেই মাটির দিকে টানে। বস্তুত, খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ বছর আগে প্যাগান হেলেনিস্টিক এস্ট্রনমি উদ্ভূত স্ফেরিক্যাল পৃথিবীর সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া যাচ্ছিল না। এ সমস্যা সমাধানের জন্যই গ্রাভিটির জন্ম হয়, যা স্ফেরিক্যাল আর্থের সকল আনসলভড প্রশ্নের সমাধান দেয়।

দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে গ্রাভিটি কখনোই সাইন্টিফিক ম্যাথড দ্বারা প্রমানিত নয়। কোন এক্সপেরিমেণ্টে এর অস্তিত্বকে ধরা যায় নি, যার জন্য এই থিওরিকে সারাজীবন কল্পনাজগতেই সীমাবদ্ধ রেখে খাতা কলম আর যাবতীয় গাণিতিক হিসাবনিকাশের গভীতে থেকে স্ফেরিক্যাল গ্লোব আর্থ আর হেলিওসেন্ট্রিক ডক্ট্রিনকে সেইফজোনে রাখার মান হিসেবে কাজ করছে।

প্রচন্ড শক্তিশালী গ্রাভিটি , যা কিনা সারাবিশ্বের মহাসাগরের সুবিশাল জলরাশিকে প্রতি ঘন্টায় ১০০০ মাইল গতির ঘূর্ণনকে উপেক্ষা করে , সুনামির ন্যায় জলরাশির কোনরূপ অস্থিরতা ছাড়াই মাটির সাথে আটকে রাখছে, অথচ সমুদ্রের পানিতে হাত দিয়ে ঝাপটা দিলেই কিছু পরিমান পানি কণার আকারে শূন্যে উঠে যাচ্ছে ! এত শক্তিশালী গ্রাভিটি সামান্য কয়েক ফোটা আকড়ে রাখতে পারে না অথচ কি করে হাজার হাজার গ্যালন পানি মাটিতে নিশ্চলভাবে ধরে রাখে!/??

কি করে একটি দুর্বল প্রজাপতি গ্রাভিটিকে অবজ্ঞা করে শূন্যে ভাসতে পারে? যেহেতু সকল জিনিসকে তার কেন্দ্রের দিকে টানছে , তাহলে আপেক্ষিকভাবে দুর্বল ঘাস কি করে সোজা হয়ে আসমানের দিক বড় হয় , উচিৎ ছিল সোজা ভাবে না গজিয়ে মাটিতে নুইয়ে পড়া।

হিলিয়াম বেলুন কি ধরনের এন্টি গ্রাভিটি মেশিন!! কারন মধ্যাকর্ষন শক্তিকে উপেক্ষা করে উপরের দিকে যেতে থাকে । এত শক্তিশালী গ্রাভিটিকে অবজ্ঞা করে সামান্য হিলিয়াম বেলুন গ্রাভিটির অস্তিত্বকে হাস্যকর করে দিল না?? পানি যুক্ত কোন বলকে ঘুরানো হলে তাতে বিপুল পরিমানে আকর্ষনসৃষ্টিকারী ফোর্স থাকুক বা না-ই থাকুক তার পানি ঘূর্ণনের দরুন ছিটকে যাবেই। চিত্রের ছবি লক্ষ্য



করুন।

কিন্তু সুবিশাল জলরাশিকে হাজার মাইল ঘূর্ণনগতি থেকে প্রভাব মুক্ত রাখতে হলে গ্রাভিটির মাত্রা এত বেশি হতে হবে যেন পানি জমিনে আঠার মত লেগে থাকে। একারণে গ্রাভিটির অস্তিত্ব ও পৃথিবীর মোশন সত্যি হলে কার্ভড জমিনে আমাদের স্বাভাবিক বিচরনকে প্রশ্ন বিদ্ধ করে।

সূর্য, চাঁদ & পৃথিবী যখন একই রেখায় অবস্থান করে তখন এদের আকর্ষণ বলের মান সবচেয়ে বেশি। এর ফলে তাদের পরস্পরের নিকটবর্তী হওয়ার কথা এবং এদের কেউ যদি তাদের কক্ষপথ থেকে সামান্য বিচ্যুত হয় তবে তারা কখনেই আগে অবস্থানে ফিরে যেতে পারবে না সাথে সাথে তাদের মধ্যে ততই আকর্ষণ বল বড়বে এর ফলে তারা আরও কাছে আসতে থাকবে যে পর্যন্ত না তারা একে অপরের উপর পতিত হয়। এটা ঘটনা শুধু আমাদের সোলার সিস্টেমে ঘটবে তাই না বরং এটা মহাবিশ্বের সকল সিস্টেমে ঘটবে এবং মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। অথচ এরূপ অনেক আগেই ঘটতে পারত যদি গ্রাভিটির অস্তিত্ব থাকত, অথচ এরূপ কিছু নিয়ে কেউ চিন্তাগ্রস্তও নয়!!

গ্রাভিটি কিভাবে বোঝে যে কোথায় কতখানি বল প্রয়োগ করতে হবে কারণ পৃথিবী গোল হওয়ার কারণে একেক অঞ্চলে এক এক গতিতে ঘোরে।

## REALITY:

বাস্তবে গ্রাভিটি একদমই নস্পেসিক্যাল। একদমই পুরাতন এবং সাইন্টিফিকভাবে অবজারভেবল যে ব্যাখ্যাটা কোন বস্তুর নিম্নদিকে পতনকে ব্যাখ্যা করে সেটা হচ্ছে ডেন্সিটি এবং পানির ক্ষেত্রে বয়োলিসি। আশপাশের বাতাসের মলিকিউলস এর



তুলনায় যখন কোন বস্তুর ঘনত্ব বেশি এবং ভারী হবে তখন তার পতন ঘটে।  
আবার বাতাসের মলিকিউলসের চেয়ে কোন জিনিস কম ঘনত্বের ও হালকা হয়  
তখন তা শূন্যে ভাসতে থাকে। যেমনঃ হিলিয়াম বেলুন।

এখানে গ্রাভিটি বা অন্য কোন ফোর্সফিল্ড কাজ করে না। এ বিষয়টিই বাস্তবজগতে  
বাস্তব। গ্রাভিটি শুধুই মহাশূন্যে স্ফেরিক্যাল পৃথিবীর কার্ভে বস্তুর লেগে থাকার  
imagery ব্যাখ্যা দেয়।

গ্রাভিটির অস্তিত্বটা সুডোসাইন্সের আওতায় হলেও মেইনস্ট্রিম বিজ্ঞানের কাছে এটা  
অবিচ্ছেদ্য বিষয়। একবার ভাবুন, যদি গ্রাভিটি না থাকে, তবে..

১.পৃথিবী স্ফেরিক্যাল নয়

২.আউটার স্পেসের ধারণা মিথ্যা

৩.সোলার সিস্টেম, হেলিওসেন্ট্রিক রিভলভিং থিওরি একদম ব্রেকডাউন।

৪.এর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিগব্যাং এবং বিবর্তনবাদও মিথ্যা।

গ্রাভিটি, ইন্টারস্টেলার ইত্যাদি হলিউড ফিল্ম চরম ব্রেইনওয়াশিং ফিল্ম। এসব  
ফিল্ম মানুষ সরল মনে দেখলে প্রচলিত মহাকাশ বিজ্ঞানকে অস্বীকার করতে পারবে  
না, সেই সাথে সাবকনশাসলি গ্রাভিটিকেও। এভাবেই কাফেররা প্রোগ্রামিং চালিয়ে  
যাচ্ছে। আর আমরাও বিশ্বাস করছি।

<https://m.youtube.com/watch?v=MQ7tLZI8fT8>

<https://m.youtube.com/watch?v=g1W0SCmXZnw>

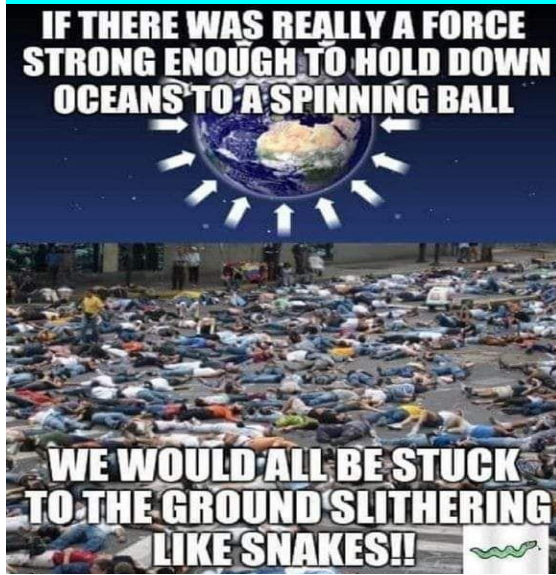
<https://m.youtube.com/watch?v=cMuM-DWcgog>

কিছু বইঃ

<http://www.feandft.com/.../Gravity-Theories-of-Newt-and-Einy-...>

<http://www.gsjournal.net/old/science/guerami.pdf>

**অভিকর্ষ: রক্তে মাংসের মানুষ, জীব বা উদ্ভিদ কে কিভাবে আকর্ষণ করে?**

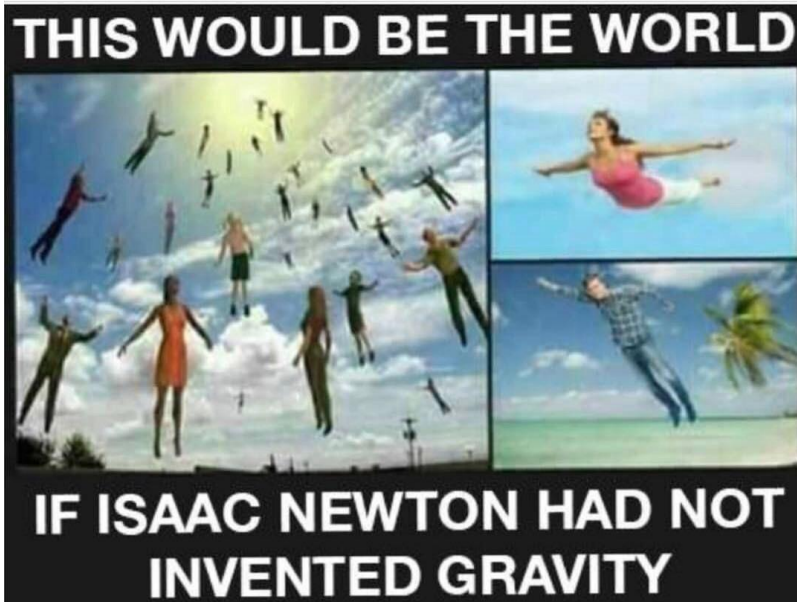


পৃথিবীতে থাকা প্রত্যেকটা বস্তুর নিয়ম সে মাটিতে বা জমিনে থাকবো কেননা মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়াতাতাআ'লা পবিত্র কুরআন এ উল্লেখ করেছেন,  
 أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا  
 আমি কি জমিনকে বিছানা বানাইনি? [সূরা নাবা, আয়াত ৬]

অর্থাৎ, বিছানায় থাকাকালীন এর উপরস্থ সবকিছু যেরকম বিছানামুখী হয়ে থাকে, পৃথিবীও সেই বিছানার মত, এর ভূমির উপরস্থ সবকিছু জমিনমুখীই হয়ে থাকবে, এটাই আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত, এখানে আলাদা করে গ্র্যাভিটি নামক কোনো ফোর্সের প্রয়োজন নেই মোটেই।

মানুষ তার যতটুকু বল প্রয়োগ করবে ততটুকু উপরে উঠতে পারবে পরে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে, ইহাই স্বাভাবিক। মেইনস্ট্রিম মিডিয়ায় নিউটনের কাহিনীকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের কাছে বিষয়টিকে খুব স্বাভাবিক সেন্স হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই অভিকর্ষ মূলত হাজারো বছরের পুরনো যাদুবিদ্যার অংশবিশেষ, বিস্তারিত দলিলাদি সহ সমস্ত প্রমাণ আল ইমরান ভাই রচিত "বিজ্ঞান নাকি অপবিজ্ঞান" বইয়ে পাবেন।

পৃথিবীতে আছে নির্দিষ্ট বায়ুচাপ যা মানুষকে নিজের জমিনে বা মাটিতে রাখতে সাহায্য করে আবার এই বায়ুর উপরে ভর করে পাখি উড়ে এখানে অভিকর্ষ বলতে কিছুই অবস্থান নেই।



বিজ্ঞান মতে পৃথিবীর কেন্দ্রে গলিত বিভিন্ন ধাতু বিদ্যমান যা পৃথিবীর কোনো বস্তুকে তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। পৃথিবীর কেন্দ্রে ধাতু গুলো হলো লোহা, নিকেল

গলিত অবস্থায় যা নাসা বলেছেকিন্তু এই গলিত লোহা আর ধাতু যদি পৃথিবীতে থাকা ধাতুকে আকর্ষণ করে তাহলে মানা যেত যে এটা সত্য কিন্তু রক্তে মাংসে গড়া মানুষ বা অন্যান্য জীব বা উদ্ভিদ কে কিভাবে আকর্ষণ করে। আর পৃথিবীতে থাকা ধাতু এর মধ্যেও অনেকগুলো আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করে না সেখানে মানুষ, পশুপ্রাণী এগুলো কিভাবে করে?

এই ফোর্স কোথেকে এসেছে প্রশ্ন করলেই বিজ্ঞানীরা পালায়, পরে এটাকে কোয়ান্টাম ফিজিক্সের মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে বটে কিন্তু ব্যর্থ সেখানেও, উপযুক্ত প্রমাণ বইয়ে পাবেন।

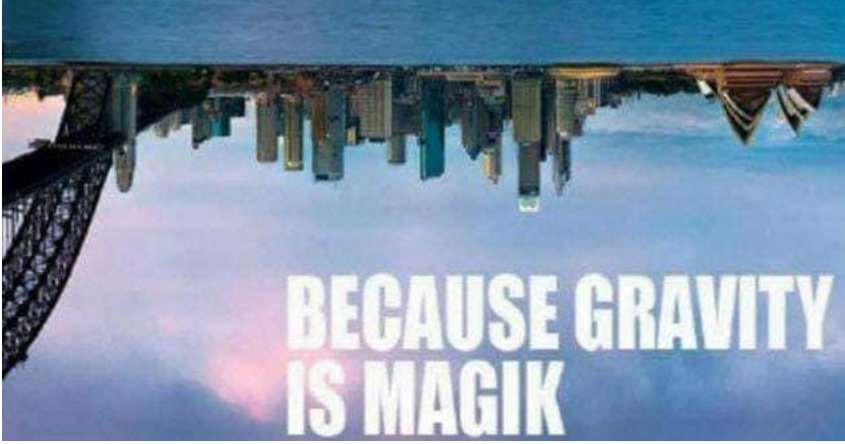


think deeply, যদি সেরকম কোনো ফোর্স আদৌ থাকতো যা সার্বক্ষনিক ভূমির উপরস্থ সবকিছুকে সর্বদা নিচের দিকে টানছে তাহলে কোনোভাবেই প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব ছিল না, কেননা কোনো উদ্ভিত পৃথিবীতে জন্ম নিতে পারত না।

উদ্ভিত জন্ম নেয় বীজ থেকে, বীজ থেকে মাটির নিচ থেকে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠে আসতে থাকে, এক পর্যায়ে রবের রহমতে তা পূর্ণাঙ্গ গাছে পরিণত হয়,

এখন আপনারাই বলুন, যদি আদৌ কোনো ফোর্স থাকত তাহলে কীভাবে এত নরম কিছুর পক্ষে সম্ভব হতো সেই ফোর্সকে উপেক্ষা করে বাহিরের কোনো বল ছাড়াই উপরের দিকে উঠে আসতে? ইহা কস্মিনকালেও সম্ভব ছিল না।

আবার ধরুন, যেই গ্র্যাভিটি গোটা সমুদ্রকে নিচের দিকে নাকি আকর্ষণ করে ধরে রাখছে, সেই সমুদ্রের উপর দিয়ে পাখি উড়ে যায় কীভাবে?



Ask yourself. এভাবে অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যায়, reality observe করুন, ব্রেইনওয়াশ হয়ে আছে আপনাদের মাথা ও অন্তর, ঠান্ডা মাথায় ভাবুন নিরপেক্ষভাবে, এন্তেখারা আদায় করুন, এই গ্র্যাভিটি হলো কাব্বালাহ'র এক ভয়ানক ফাদ, ইহার শয়তানি বিশ্বাস থেকে মুক্ত হতে পারলে ইনশাআল্লাহ সৃষ্টিজগত চেনা তুলনামূলক সহজ হয়ে যাবো।

মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়াতাতাআ'লা আমাদের সবাইকে সত্য সঠিকভাবে জানার ও বুঝার তাউফিক দান করুক।

### **বিজ্ঞানপ্রেমীরা“কিফাতান” শব্দটি দিয়ে গ্র্যাভিটি প্রমাণ করতে চায়:**

ওরা দাহাহার অর্থকে যেভাবে বিকৃত করেছে ঠিক একই ভাবে সূরা মুরসালাতের ২৫ নং আয়াতের কিফাতান শব্দটিরও বিকৃত অর্থ দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে।

## এবার আয়াতটি দেখুন। এবং তার অর্থও দেখে নিন।

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا

আমি কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারিণীরূপে, [ সূরা মুরসালাত ৭৭:২৫ ]

أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا

জীবিত ও মৃতদেরকে? [ সূরা মুরসালাত ৭৭:২৬ ]

## এবার আয়াত দুটোর তাফসীর দেখুন।

“আলাম্ নাজ্জু’আলিল্ আরদ্বোয়া কিফা-তান্। আহ্ইয়া~য়াও অআম্ওয়া-তাও”

অর্থাৎ, ‘আমি কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারিণীরূপে’ (আয়াতঃ ২৫-২৬) —

অর্থাৎ, আমি কি ভূমিকে জীবিত ও মৃত মানুষদের জন্য ‘কিফা-তান’ করিনি?

‘কিফা-তান’ শব্দটি ‘ফিফাত’ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ মিলানো। ‘কিফাত’ সেই

বস্তু, যে অনেক কিছুকে নিজের মধ্যে ধারণ করে। ভূমিও জীবিত মানুষকে তার পৃষ্ঠে এবং সকল মৃতকে তার পেটে ধারণ করে।

## আরো একটি আলোচনা পড়ুন।

((আল্লাহ নগণ্য বীৰ্য দ্বারা মানুষ সৃষ্টির সূচনা করে তাকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে রূপান্তরিত করেছেন যে পৃথিবীতে বাস করে মৃত্যুর পর তার শরীরের বিভিন্ন অংশ সেখান থেকে উদ্ধার হয়ে যায় না। বরং তার দেহের এক একটি অণু পরমাণু এ পৃথিবীতেই বিদ্যমান থাকে। পৃথিবীর এ মাটির ভাগুর থেকেই সে সৃষ্টি হয়, বেড়ে উঠে ও লালিত-পালিত হয় এবং পুনরায় সে পৃথিবীর মাটির ভাগুরেই গচ্ছিত হয়। যে আল্লাহ মাটির এ ভাগুর থেকে প্রথমবার তাকে বের করেছিলেন তাতে মিশে যাওয়ার পর তিনি তাকে পুনরায় বের করে আনতে সক্ষম))।



وَيُلْ يُؤْمِنُ لِلْمُكَذِّبِينَ দুর্ভোগ সেইদিন মিথ্যারোপকারীদিগের জন্য।  
অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءُ وَأَمْوَاتًا অর্থাৎ আমি কি যমীনকে জীবিত ও মৃতের জন্য ধারণকারীরূপে সৃষ্টি করি নাই? অর্থাৎ যমীনকে আমি তোমাদিগের এই খিদমতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি যে, উহা জীবিতাবস্থায় তোমাদিগকে পিঠে বহন করিবে আর মৃত্যুর পর পেটে ধারণ করিবে? শা'বী, মুজাহিদ ও কাতাদা (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ অর্থাৎ যমীনের উপর সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছি যাহাতে যমীন হেলিয়া দুলিয়া না পড়ে।

وَأَسْقَيْنُكُمْ مَاءً فُرَاتًا অর্থাৎ আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করিয়া এবং যমীন

তাফসীরে ইবনে কাসির থেকেও একটি স্ক্রিন শট দেয়া আছে। অবশ্যই দেখে নিন। আপনাদের বুঝার সুবিধার্থে আরো অনেকগুলো স্ক্রিন শট দিয়ে দিলাম। সবজায়গায়, কিফাতানের অর্থ করা হয়েছে ধারণকারী। আপনারা নিজেরাও খুঁজে দেখতে পারেন। অথচ ওরা এটার অর্থ করে আকর্ষণকারী। আর এর দ্বারা প্রমাণ করতে চায় মিথ্যা, অযৌক্তিক ও অবাস্তব গ্রাভিটি তত্ত্বকে।

## ২৫. আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করি নাই ধারণকারীরূপে, ২৬. জীবিত ও মৃতের জন্য?

bn.wikipedia.org/wiki/সূরা\_আল-মুরসালাত

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا

আমি কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারীরূপে,

أَحْيَاءُ وَأَمْوَاتًا

জীবিত ও মৃতদেরকে?

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنُكُمْ مَاءً فُرَاتًا

আমি তাতে স্থাপন করেছি মজবুত সুউচ্চ পর্বতমালা এবং পান করিয়েছি তোমাদেরকে তৃষ্ণা নিবারণকারী সুপেয় পানি।

وَيُلْ يُؤْمِنُ لِلْمُكَذِّبِينَ



আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারী রূপে – মুজিবুর রহমান

Have We not made the earth a container Sahih International

২৫. আমরা কি যমীনকে সৃষ্টি করিনি (২৫) আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারী  
ধারণকারীরূপে, রূপে।

তাফসীরে জাকারিয়া

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

### নিউটনকে কেন কথিত মহাকর্ষ বলের আবিষ্কারক বলা হচ্ছে?

কথিত আছে, আইজ্যাক নিউটন একদিন আপেল বাগানে বসে জগতের নানাবিধ রহস্য সম্পর্কে চিন্তায় আত্মমগ্ন ছিলেন। এমন সময় গাছ থেকে একটি আপেল মাটিতে পড়ল। অমনি নিউটনের মাথায় প্রশ্ন জাগল, গাছ থেকে আপেল সব সময় নিচে পড়ে কেন? কেন আপেল উপরের দিকে যায় না? এর কিছু দিন পরেই ১৬৮৭ সালে নিউটন মহাকর্ষ বল আবিষ্কার করেন, যার জন্য আজও সারা পৃথিবী তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে থাকে।

#### DID YOU KNOW?

**Before Isaac Newton discovered gravity in 1687, people could fly.**



উপরের গল্পটা পড়ে পাঠকের মনে কখনও প্রশ্ন জেগেছে কি যে, ১৬৮৭ সালের আগে কি কেউ জানত না গাছ থেকে আপেল নিচে পড়ে? প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা মহাকর্ষ বলের অস্তিত্ব না জেনে কীভাবে গড়ে তুলল সুউচ্চ পিরামিড? নিউটনের আগমনের আগে কৃষক, মজুর, ব্যবসায়ীরা কীভাবে তাদের কাজ করত মহাকর্ষ বল সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে? নিশ্চয়ই তাদের ধারণা ছিল যে, পাহাড় থেকে লাফ দিলে একটা মানুষ নিচেই পড়বে, মাঠে ধানের বীজ ছিটিয়ে দিলে সেটা নিচের দিকেই পড়বে। আচ্ছা, তাহলে নিউটনকে কেন বলা হচ্ছে মহাকর্ষ বলের আবিষ্কারক? উত্তরটা খুব সহজ। গাছ থেকে আপেল নিচে পড়ে, পাহাড় থেকে লাফ দিলে মানুষ নিচের দিকেই পড়বে — এগুলো আমাদের “অবজারভেশন”, এগুলোকে “বিজ্ঞান” বলা যায় না। মানব সভ্যতার শুরু থেকেই সবাই এগুলো জানত। শুধু মানুষ না, সব পশু-পাখিরাও এই ব্যাপারে অবগত বলেই নিজেদের জীবন বাঁচিয়ে বংশবিস্তার করে টিকে আছে।

**RM:** আসলে শয়তান খুব সাধারণ জিনিসগুলোকে মানুষের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ করে তুলে ধরে। যাতে মানুষ তার আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ভুলে যায়। বস্তু নিচের দিকে কেন পরে? পাতার রং কেন সবুজ হয়? ইত্যাদি অহেতুক বিষয়ের পিছনে পরে থাকা মুমিনের কাজ নয়। মুমিন তো সারাক্ষণ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকবে। কিন্তু বিজ্ঞান নামক জিনিসটি আজ মানুষকে অসংখ্য অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে পরে থাকা শিখিয়েছে। ফলে মানুষ আখেরাতকে ভুলে গেছে।

**N:B:** আমি আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করা যাবে না, সেটা বলছি না। বলতে চাচ্ছি অহেতুক ও অনুপকারী জিনিস নিয়ে গবেষণা করে সময় নষ্ট করাটা বোকামি। শয়তান চায় মানুষ এসব নিয়েই তার জিন্দেগী শেষ করে দিক।

আর এজন্যই তো কথিত বিজ্ঞানীরা তাদের পুরো জীবনটা এসবের পিছনে নিঃশেষ করে দেয়া এতো গবেষণা করে কিন্তু তার রবের পরিচয় পায়না। তো কি লাভ এই সব বস্তুপচা গবেষণার পিছনে সময় ব্যায় করে?

### নিউটন ছিল একজন প্রসিদ্ধ আলকেমিস্ট

নিউটনের আসল পরিচয় আমরা আজও জানি না। এগুলো আসলে প্রকাশ করলে বিজ্ঞানের origins ও rationality তে প্রশ্ন তৈরি হয়। এজন্য বিগত শতাব্দীকাল ধরে তার ব্যপারে সত্যকে আড়ালে রাখা হয়েছে। তার আসল পরিচয় খুব বেশি দিন হয়নি প্রকাশ হয়েছে। ১৯৩৬ সালে নিউটনের লেখা অজস্র বই, কাগজ পত্র নিলামে ওঠে, জন মেনার্ড কিনস নামের এক ধনাঢ্য ব্রিটিশ ইকোনোমিস্ট সেসব জিনিসগুলোকে কিনে নেয়।



*In 1936, a descendant offered the papers for sale at Sotheby's.[139] The collection was broken up and sold for a total of about £9,000.[140] John Maynard Keynes was one of about three dozen bidders who obtained part of the collection at auction. Keynes went on to reassemble an estimated half of Newton's collection of papers on alchemy before donating his collection to Cambridge University in 1946.[ উইকিপিডিয়া]*

নিউটনের অধিকাংশ লেখাগুলোই ছিল দুর্বোধ্য কোডিং দ্বারা এনক্রিপ্ট করা। সেগুলো সাধারণ মানুষের পাঠোদ্ধার সম্ভব না। যেগুলো সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করা তাও বিভিন্ন রূপক আর কাব্যিক ছন্দে লেখা। জন মেনার্ড প্রায় ৬ বছর ধরে নিউটনের লিখিত বিভিন্ন নিবন্ধ অনুচ্ছেদ গুলো পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করে সফল হন। এতে নিউটনের আরেক রূপ বিশ্ববাসীর কাছে প্রকাশিত হয়। সেটা এই যে, উনি মোটেও বিজ্ঞানী বলতে যা বোঝায় তা ছিলেন না, বরং একজন খাটি অকাল্টিস্ট বা যাদুকর! জন মেনার্ড কিম্ব বলেনঃ **"Newton was not the first of the age of reason: He was the last of the magicians."**[উইকিপিডিয়া]

বিস্তারিতঃ [https://wikipedia.org/wiki/Isaac\\_Newtons\\_occult\\_studies](https://wikipedia.org/wiki/Isaac_Newtons_occult_studies)

একদম শৈশবে নিউটন পিতাকে হারায়, পিতার মৃত্যুর পর নিউটনের শিশুকালেই তার মা এক লোককে বিয়ে করে। মায়ের এ বিবাহ নিউটন একদমই মেনে নিতে পারেনি। তার মধ্যে মা ও তার সং পিতার প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মায়, কৈশোর বয়সে একবার তাদের উভয়কে আগুনে জ্বালিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিলেন বলে নিউটন স্বীকার করেন। নিউটন শিশুকাল থেকেই অন্তর্মুখী প্রকৃতির ছিলেন, শিশুকালেই তিনি সানডায়ালসহ বেশ কিছু জিনিসের ডিজাইন করে ফেলেন।

শিক্ষাজীবনে নিউটন একা একাই কাটান। গম্ভীর ভাবুক প্রকৃতির নিউটন খুব কমই ঘর থেকে বের হতেন, তার এক বন্ধু মাঝেমাঝে আসতো, তার সাথেও তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। নিউটন সারাক্ষণ ডুবে থাকতেন **mysticism, esoteric**

philosophy নিয়ে। সেদিকেই তার আকর্ষণ। সারা দিন ঘরের এক কোণে বসে বিভিন্ন occult text(যাদুশাস্ত্র) নিয়ে অনুসন্ধান ছিল তার দৈনন্দিন কাজ। তিনি প্রাচীন যাদুশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্র উভয় সংগ্রহ করতেন গুপ্তবিদ্যা অর্জনের জন্য। রেনেসাঁ পরবর্তী সময়ে যাদুশাস্ত্রের প্রতুলতার জন্য সেসব সংগ্রহে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি।

তিনি ভাবতেন বাইবেলের মধ্যেও কোন না কোন বাতেনি জ্ঞান থাকতে পারে। এজন্য দীর্ঘ একটা সময় বাইবেলের বিভিন্ন অনুবাদ নিয়ে গবেষণা করেন। এজন্য অনেক মানুষ তাকে ধর্মভীরু খ্রিষ্টান বানিয়ে ফেলেছে। শুধু বাইবেলই না, তিনি সোলাইমান(আ:) সিংহাসনের স্থানের ব্যপারেও অনেক গবেষণা করে, উদ্দেশ্য শুধুই কিছু অধিবিদ্যা অর্জন, কিছু বাতেনি বিদ্যা হাসিল, মিস্টিক্যাল ইনিসিয়েশন লাভ, আর যাদুকরদের চিরাচরিত উদ্দেশ্যঃ প্রকৃতির কাযনীতির ব্যপারে জ্ঞান লাভ। এজন্য এমনকি প্রাচীন বহু প্যাগান মন্দিরের নির্মাণশৈলী, জ্যামিতিক নকশা নিয়েও গবেষণা করেছেন। উইকিপিডিয়াতেও এসেছেঃ

*Newton spent a great deal of time trying to discover hidden messages within the Bible.*

*In addition to scripture, Newton also relied upon various ancient and contemporary sources while studying the temple. He believed that many ancient sources were endowed with sacred wisdom[6] and that the proportions of many of their temples were in themselves sacred. This belief would lead Newton to examine many architectural works of Hellenistic Greece, as well as Roman sources such as Vitruvius, in a search for their occult knowledge.*

*Newton felt that just as the writings of ancient philosophers, scholars, and Biblical figures contained within them unknown sacred wisdom, the same was true of their architecture. He believed that these men had hidden their knowledge in a complex code of symbolic and mathematical language that, when deciphered, would reveal an unknown knowledge of how nature works.[ উইকিপিডিয়া]*

এজন্য কেউ যদি মনে করে, তিনি খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতি অনুরাগ বা ভক্তির দরুন ধর্মশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করতেন, তবে নিঃসন্দেহে এরূপ ধারণাকারী ব্যক্তি নিতান্ত অজ্ঞ। ইহুদি রহস্যবাদ ও যাদুবিদ্যা কাব্বালাহ, বায়তুল মুকাদ্দাস নিয়ে আগ্রহ তার কথিত খ্রিষ্টান পরিচয়কে প্রশ্নের মুখে ফেলো।



নিউটনের হৃদয় বক্রতা ও কুফর দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তিনি প্রচলিত খ্রিষ্টান ধর্মকে সঠিক মনে করতেন না। তিনি ত্রিতত্ত্ববাদকে অগ্রহণযোগ্য মনে করতেন। তার ননট্রিনিটারিয়ান বিশ্বাস দেখে অনেক বায়োগ্রাফার, স্কলারগন মনে করতেন তিনি খ্রিষ্টান নন বরং Deist। ডেইজম হচ্ছে এমন বিশ্বাস ব্যবস্থা যেখানে একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয়, এরকমটা ধারণা করা হয় যে সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছেন বটে কিন্তু এখন তিনি আসমান যমীনের নিয়ন্ত্রন করছেন না, তিনি দুনিয়ার সম্পর্কে এমনকি বেখবর(নাউজুবিল্লাহ), কিন্তু সমস্যা হচ্ছে নিউটনের ঈশ্বর সম্পর্কে

আকিদা হলো, ঈশ্বর প্রতিনিয়ত পৃথিবীকে পরিচালনায় ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ(ডিভাইন ইন্টারভেনশান) করতেন। Leibniz কিছুটা আক্রমণ করেই নিউটনের ব্যপারে তার এক বন্ধুকে চিঠিতে লেখেঃ

**"Sir Isaac Newton and his followers have also a very odd opinion concerning the work of God. According to their doctrine, God Almighty wants to wind up his watch from time to time: otherwise it would cease to move. He had not, it seems, sufficient foresight to make it a perpetual motion."**[উইকিপিডিয়া]

নিউটন যতই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের কথা বলুক না কেন, ত্রিশ বছরে পা দেওয়ার সময় পর্যন্ত নিজেকে বাহ্যিকভাবে সমাজে খ্রিষ্টান পরিচয় দিলেও তিনি তার অন্তরের আসল বিশ্বাস কখনোই খোলাখুলি প্রকাশ করেন নি। আগে তাকে অনেকে একেশ্বরবাদী খ্রিষ্টান হিসেবে চিহ্নিত করত, কিন্তু সাম্প্রতিককালে তার আসল মুখোশ উন্মোচিত হলে heretic বলা হয়। তিনি খ্রিস্ট ধর্মের বিশ্বাস তো লালন করতেনই না, উপরন্তু ব্রুনো, গ্যালিলিওদের ন্যায়ই হেরেটিক ছিলেন। এ ধারণা খোদ ইতিহাসবিদরাই করেন। তিনি হয়ত কঠিন শাস্তির ভয়েই আসল বিশ্বাসকে প্রকাশ করেন নি। এজন্য তাকেও নিকোডেমাইটদের কাতারে ফেলা হয় যারা লাঞ্ছিত হবার ভয়ে বিশ্বাস ও চিন্তাধারাকে ঢেকে রাখে।

*Although born into an Anglican family, by his thirties Newton held a Christian faith that, had it been made public, would not have been considered orthodox by mainstream Christianity;[113] in recent times he has been described as a heretic.*

*Like many contemporaries (e.g., Thomas Aikenhead) he lived with the threat of severe punishment if he had been open about his religious beliefs. Heresy was a crime that could have been punishable by the loss of all property and status or even death (see, e.g., the Blasphemy Act 1697). Because of his secrecy over his religious beliefs, Newton has been described as a Nicodemite.[9]*

*Historian Stephen D. Snobelen says, "Isaac Newton was a heretic. But ... he never made a public declaration of his private faith—which the orthodox would have deemed extremely radical. He hid his faith so well that scholars are still unravelling his personal beliefs."[114][ উইকিপিডিয়া]*

যারা তাকে ননট্রিনিটারিয়ান আরিয়ান খ্রিষ্টান বলে দাবি করত, তারা একদমই ভুল করেছে কেননা তিনি শয়তানের বা জ্বীনদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। তিনি খ্রিষ্টীয় অর্থোডক্স বিশ্বাসঃ আত্মার অমরত্বেও অবিশ্বাস করতেন।

*As well as being antitrinitarian, Newton allegedly rejected the orthodox doctrines of the immortal soul,[9] a personal devil and literal demons.[9][ উইকিপিডিয়া]*

তিনি এক ঈশ্বরে বিশ্বাসের কথা বলেতেন। শোনা যায় তার এই বিশ্বাস কিছুদিন সর্বেশ্বরবাদী দার্শনিকদের বিপাকে ফেলো। কিন্তু তার ঈশ্বর monism এর ঈশ্বরের ধারণার অনুরূপ সর্বত্র বিদ্যমান(উপরে আগেই উল্লেখ করেছি)। নিউটনের সৃষ্টিকর্তার ব্যপারে বিখ্যাত উক্তি হচ্ছেঃ

**"This most beautiful system of the sun, planets, and**

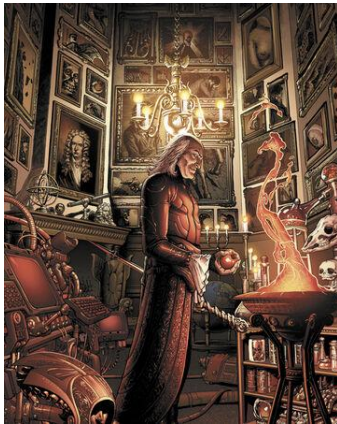


comets, could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent Being. [...] This Being governs all things, not as the soul of the world, but as Lord over all; and on account of his dominion he is wont to be called "Lord God"  $\pi\alpha\nu\tau\omicron\kappa\rho\alpha\tau\omega\rho$  [pantokratōr], or "Universal Ruler". [...] The Supreme God is a Being eternal, infinite, [and] absolutely perfect"

### Sir Isaac Newton

এখন প্রশ্ন আসে এই ইউনিভার্সাল শাসক কাকে বোঝানো হয়েছে! ইব্রাহীমের(আঃ) রব নাকি অন্য কেউ? এটা বুঝতে লেখার শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। নিউটনের ধর্মতাত্ত্বিক লেখনী এবং বিবলিক্যাল কিতাবাদিতে অনুসন্ধান সংক্রান্ত সবকিছু ১৬৭০ থেকে ১৬৯০ এর মধ্যে সংঘটিত হয়।

*Newton did not publish any of his works of biblical study during his lifetime.[3][58] All of Newton's writings on corruption in biblical scripture and the church took place after the late 1670s and prior to the middle of 1690.[ উইকিপিডিয়া]*



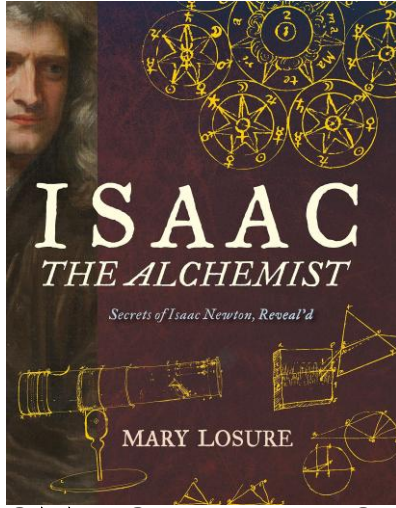
বাইবেল এর পাশাপাশি নিউটন আরো কিছুর মধ্যে ডুবে থাকতেন, তা হচ্ছে যাদুশাস্ত্র। তিনি হামেটিক, কাব্বালিস্টিক, পিথাগোরিয়ান-প্লেটনিক সমস্ত যাদুবিদ্যা সংক্রান্ত লেখনী নিয়ে গভীরভাবে ডুবে থাকেন। এরপরে শিক্ষাজীবনের একটা পর্যায়ে বাস্তব পর্যায়ে সরাসরি যাদুচর্চার দিকে হাটেন। তিনি হামেটিসিজমের অন্তর্ভুক্ত আলকেমি চর্চাশুরু করেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে কোন ধরনের খ্রিষ্টান নিষিদ্ধ বিদ্যা নিয়ে পড়ে থাকে এবং যাদুচর্চায় মনোনিবেশ করে!/? তিনি corpus hermeticum নিয়ে গভীর গবেষণা চালান। এমনকি হামেটিক শাস্ত্র অনুবাদ পর্যন্ত করেন(ডানের ছবিতে দ্রষ্টব্য)। আজ পর্যন্ত এ সংক্রান্ত অনেক শয়তানি যাদুশাস্ত্রের গবেষণা অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে। উইকিপিডিয়ায় এসেছেঃ

*Isaac Newton placed great faith in the concept of an unadulterated, pure, ancient doctrine, which he studied vigorously to aid his understanding of the physical world.[17]Many of Newton's manuscripts—most of which are still unpublished[17]—detail his thorough study of the Corpus Hermeticum, writings said to have been transmitted from ancient times, in which the secrets and techniques of influencing the stars and the forces of nature were revealed, i.e. As Above, So Below.[ উইকিপিডিয়া]*

নিউটনের সময় বিজ্ঞান ছিলই না, ছিল ন্যাচারাল ফিলসফি। আজকের কথিত র্যাশনাল বিজ্ঞানের জন্য নিউটন কাজ করতেন না বরং কাজ করতে যাদুবিদ্যা নিয়ে। তার মূল লক্ষ্যই ছিল প্রাচীন ব্যাবিলনীয়ান কুফরি যাদুবিদ্যাকে পুনরুজ্জীবিত করা। উইকিপিডিয়াতে একই কথা এসেছেঃ

*Newton's scientific work may have been of lesser personal*

*importance to him, as he placed emphasis on rediscovering the occult wisdom of the ancients.*



নিউটন ছিল একজন প্রসিদ্ধ আলকেমিস্ট। আলকেমির প্রতি তিনি এত বেশি মাত্রায় আবিষ্ট ছিলেন যে বলা যায়, তার লিখিত ১০ মিলিয়ন শব্দের ১ মিলিয়ন ছিল আলকেমির উপর। এর অধিকাংশই ছিল হার্মেটিক দর্শনকেন্দ্রিক এবং সেসব স্তরের পর স্তর allegory ও imagery দ্বারা ভরা দুর্বোধ্য বাক্য। একবার নিউটনের ব্যক্তিগত আলকেমির ল্যাবে আগুন লাগে, এতে করে তার অনেক অকাল্ট নলেজের ডকুমেন্টস নষ্ট হয়ে যায়। নিউটনের মৃত্যুর সময় তার আলকেমির উপর করা কর্মগুলোকে প্রকাশের অযোগ্য ঘোষণা দিয়ে দীর্ঘকাল ঢেকে রাখা হয়। অবশিষ্ট টিকে থাকা প্রকাশযোগ্য নিউটনের আলকেমিকে কেমিস্ট্রি নাম দিয়ে ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। রহস্যের বিষয় হচ্ছে অধিকাংশ নিউটনের যাদুবিদ্যায় করা ডকুমেন্ট গুলো ইজরাইলে চলে গেছে!

*Of an estimated ten million words of writing in Newton's papers, about one million deal with alchemy. Many of Newton's writings on alchemy are copies of other manuscripts, with his own annotations.[91] Alchemical texts mix artisanal knowledge with philosophical speculation, often hidden behind layers of wordplay,*

*allegory, and imagery to protect craft secrets.[138] Some of the content contained in Newton's papers could have been considered heretical by the church.*

*Much of Newton's writing on alchemy may have been lost in a fire in his laboratory, so the true extent of his work in this area may have been larger than is currently known.*

*At the time of Newton's death this material was considered "unfit to publish" by Newton's estate, and consequently fell into obscurity until their somewhat sensational reemergence in 1936.[9]*

*All of Newton's known writings on alchemy are currently being put online in a project undertaken by Indiana University: "The Chymistry of Isaac Newton"[142] and summarised in a book.[ উইকিপিডিয়া]*

তার ওইসব কার্যক্রম এজন্যই প্রকাশ অযোগ্য বলা হয়েছিল, যাতে করে তার বিদ্যা ও বইপত্র সাধারণ মানুষের হজমে অসুবিধা না হয়। অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ বিষকে উপাদেয় খাদ্য বলে জনগণের মধ্যে প্রবেশ করানোর প্রক্রিয়া বলা যায়। ভাল কোন লোকই যাদুকরদের থেকে জ্ঞান অর্জন করতে চাইবে না। এজন্য পরিচয় গোপন রাখার মধ্যে অভিশপ্ত কাফিররা কল্যান খুজে পেয়েছিল।

তার আলকেমির উপর গবেষণার মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল সৃষ্টির সাবস্টেনশিয়াল পরিবর্তন অর্থাৎ সেই পরশ পাথরের অন্বেষণ যার দ্বারা লোহাকে স্বর্ণে রূপান্তর করা

যায় এবং অপর উদ্দেশ্য ছিল শয়তানের দেওয়া সাজারাতুল খুলদের(tree of life) সেই প্রাচীন প্রতিশ্রুতিকে খুজে বেড়ানো, অনন্তজীবন প্রদায়ী অমৃতের(Elixir of life) অনুসন্ধান। সে তার জীবদ্দশায় চার্চের শাস্তির ভয়ে সব ধরনের নিষিদ্ধ বিদ্যাকে প্রকাশ করা থেকে দূরে রাখে।

*Newton's writings suggest that one of the main goals of his alchemy may have been the discovery of the philosopher's stone (a material believed to turn base metals into gold), and perhaps to a lesser extent, the discovery of the highly coveted Elixir of Life.*

*Due to the threat of punishment and the potential scrutiny he feared from his peers within the scientific community, Newton may have deliberately left his work on alchemical subjects unpublished. (উইকিপিডিয়া)*

অকাল্ট মিস্টিসিজম থেকে গৃহীত নিউটনিয়ান অকাল্ট বিদ্যা বা তত্ত্বকে পরবর্তীতে জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৬৮৭ সালে তার প্রিন্সিপিয়া ম্যাথম্যাটিকা পূর্ণ নামঃ 'প্রাকৃতিক দর্শনে গাণিতিক নীতি' প্রকাশিত হয়। এটা অপবিজ্ঞানের মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলো। এটাই ক্লাসিক্যাল নিউটনিয়ান মেকানিক্সের মূল ভিত্তি। এটাকে আজ সায়েন্টিফিক কিতাব ভাবা হতে পারে অথচ দেখছেন, বইয়ের নামেই ন্যাচারাল ফিলসফি উল্লেখ করা আছে! এই বইসহ তার সমস্ত তত্ত্বে যাদুশাস্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। তিনি মূলত যাদুবিদ্যারই বিভিন্ন নীতি তত্ত্বকে প্রকাশ করেন। অতঃপর তাকে বিজ্ঞান হিসেবে গ্রহন এবং মর্যাদা দেওয়া হয়। তিনি আসমানি বস্তুসমূহের সঞ্চালনের ব্যপারেও অদৃশ্য যাদুকরী শক্তির(gravity) অস্তিত্বে বিশ্বাস

করতেন যার বলে সবকিছু সচল আছে ভাবতেন। অর্থাৎ সবকিছুই তার অকাল্ট ফিলসফি থেকে নিয়ে আসা। এই অকাল্ট বেজড প্রিন্সিপিয়া কিতাবে তিনি গতির সূত্র প্রকাশ করেন, যা আজ আমাদের প্রায় সকলেরই মুখস্ত।

*It was Newton's conception of the universe based upon natural and rationally understandable laws that became one of the seeds for Enlightenment ideology.*

*His book Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (Mathematical Principles of Natural Philosophy), first published in 1687, laid the foundations of classical mechanics.*

*Many of the discoveries and mathematical formula found within Newton's Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica can be linked, often very directly, to his occult and alchemical studies. Much of his research into the movement of heavenly bodies was influenced by his belief that there are invisible, occult forces at work in the orbits of celestial bodies.*

*The Principia was published on 5 July 1687 with encouragement and financial help from Edmond Halley. In this work, Newton stated the three universal laws of motion.*

*As a spiritual man, and as an alchemist, Newton was determined that the motion of heavenly bodies was*

*motivated by invisible forces, that natural phenomena were motivated by forces spiritual, not merely physical.[15]*

*Determining that many of Newton's acclaimed scientific discoveries were influenced by his research of the occult and obscure has not been the simplest of tasks. Newton did not always record his chemical experiments in the most transparent way. Alchemists were notorious for veiling their writings in impenetrable jargon, and Newton made matters even worse by inventing symbols and systems of his own. That is part of the reason why, despite Newton's reputation, many of his manuscripts have still not been properly edited and interpreted. "They are in a state of considerable disorder," Newman says.[ উইকিপিডিয়া]*

একটা বিষয় হচ্ছে, এসব সূত্রের অধিকাংশ বিষয় মানুষের সাধারণ সহজাত বিচার বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য। যেমন ধরুন, আপনি জানেন যে কোন বস্তুকে ধাক্কা না দেওয়া হলে তা স্থির অবস্থায় থাকবে, ধাক্কা দিলে তা চলতে থাকবে। না থামলে চলতে থাকবে, গতি লাভ না করলে গতি ক্রমশ হ্রাস পাবে। বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার এর ওপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যদি কে ক্রিয়া করে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনও সেদিকে ঘটে... ইত্যাদি বিষয়গুলো তো সূত্রে এনকোড করবার প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পাইনা যেহেতু এসব একদমই observation এবং common sense এর বিষয়। এসব তুচ্ছ পর্যবেক্ষণভিত্তিক

সাধারণ জ্ঞানকে মহাবিদ্যা হিসেবে পূজো করে অবশেষে ব্যক্তিপূজার(অন্ধ অনুসরণ ও ভক্তশ্রদ্ধা) দিকে যাওয়া চরম মূর্খলোকেদের কাজ।  
(সংক্ষেপিত )

From al adiat.

post link: <https://aadiaat.blogspot.com/2019/10/blog-post.html>

### শয়তানের বাচ্চা নিউটন

তার প্রসবকৃত পদার্থ বিজ্ঞানের কঠিন একটা থিউরি হলো মহাকর্ষ-অভিকর্ষ বল। এই কাল্পনিক বল নিয়ে কত জটিল জটিল গাণিতিক সমস্যা সমাধান করলাম, দিস্তার পর দিস্তা খাতা নষ্ট করলাম। অথচ এসব কিছু একেবারেই ফাউ, বাস্তব জগতে এসবের কোন প্রয়োগ নেই, ভিত্তি নেই।

•

নিউটনের মহাকর্ষ (ভুঁওয়া) অনুকল্পঃ মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে, এ আকর্ষণ বলের মান বস্তুকণাদ্বয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক, এবং এই বল বস্তুকণাদ্বয়ের সংযোজক সরল রেখা বরাবর ক্রিয়া করে  $[F=GmM/d^2]$

•

আচ্ছা, একটা চুম্বকের টুকরা কিভাবে এ গ্রেভিটির সাথে পাল্লা দিয়ে বালু কণা তুলে আনতে পারে!?

দূর্বল মশা-মাছি, আর পাখিদের উপর কি গ্রেভিটি কাজ করে না?

তারা কিভাবে বাতাসে উড়ে বেড়ায়!?



গ্রেভিটি কেন পানিতে ভাসমান বস্তুগুলোকে তলিয়ে নিতে পারে না?

•

আচ্ছা গাঁজাখোরি তাত্ত্বিক কাহিনি ছাড়া গ্রেভিটির কি কোন বাস্তব প্রমাণ বা প্রয়োগ আছে?

কেউ কি গ্রেভিটি অনুভব করে?

বিজ্ঞানের ছাত্ররাও কি গাণিতিক হিসাব-নিকাশ ছাড়া গ্রেভিটির আগা-মাথা কিছু বুঝে?

গ্রেভিটি কি গাইবি বিষয় যে, অন্ধবিশ্বাস করতে হবে?

•

তাহলে নিউটনের মাথায় আপেল পড়লো কেন?



ভারি বস্তু নিচের দিকে পড়ে কেন, উপরে দিকে চলে যায় না কেন?

এর কারণ কি গ্রেভিটি?

না, একদম সিম্পল উত্তর: বাতাসের ঘনত্বের চেয়ে আপেলের ঘনত্ব বেশি ছিলো, তাই পড়েছে। ঘনত্ব ও ভর যার বেশি সে নিচে পড়বেই।

অপর দিকে যার ঘনত্ব-ভর কম সে উপরে উঠে যাবে, যেমন হিলিয়াম গ্যাস বাতাসের চেয়ে হালকা, তাই হিলিয়াম ভর্তি বেলুন উপরের দিকে উঠে যায়।  
সিম্পল!

## নিউটন, বিড়াল ও তার বর্তমান উত্তরসূরীরা:

নিউটন ও বিড়ালকে নিয়ে একটি ঘটনা প্রচলিত আছে। আপনারা সবাই সেটা জানেন।  
তবুও আবার দিলাম।

((নিউটনের গবেষণাগারের দরজার ভাঙা অংশ দিয়ে একটি বিড়াল যাতায়াত করত। একদিন নিউটন লক্ষ করলেন বিড়ালটির বাচ্চা হয়েছে। ফুটফুটে বিড়াল ছানাটিকে নিউটনের বেশ ভালো লাগল। বাচ্চাটি যাতে অনায়াসে গবেষণাগারে যাতায়াত করতে পারে এ জন্য তিনি মা বিড়াল দরজার যে ভাঙা অংশ দিয়ে ঘরে ঢুকত তার পাশে কেটে ছোট আরেকটি দরজা করে দিলেন। বড় ফুটো দিয়ে মা বিড়ালের সঙ্গে ছানাটিও যে ঢুকতে পারবে এ বিষয়টি নিউটনের মাথাতেই আসেনি। তিনি দুইজনের জন্য দুটো দরজা করে দিলেন।))



নিউটনকে আমরা অনেক জ্ঞানী মনে করি। সে অনেক কঠিন কঠিন বিষয়ে গবেষণা (সারাদিন অঙ্ক) করেছে ঠিকই। কিন্তু কমন সেন্স ছিল না। একই গর্ত দিয়ে দুটো বিড়ালই ঢুকতে পারে, এই সহজ বিষয়টি তার মাথায় আসে নি। সারাদিন জাদুচর্চা আর শয়তানের পূজায় ব্যস্ত থাকায় বাস্তবতার জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো।

আজকে তার উত্তরসূরীদেরও একই অবস্থা।

তারা বলাকার পৃথিবীর পক্ষে অনেক জটিল জটিল থিওরি (অঙ্ক) বুঝে, কিন্তু সমতলে বিছানো পৃথিবীর বাস্তবতাকে বুঝে না। সমতল পৃথিবীর জন্য কোনো অংকের প্রয়োজন নেই। একটু স্বাধীন ভাবে চিন্তা করলেই তা বুঝা যায় আলহামদুলিল্লাহ। যারা নিজের মগজটাকে নতুন করে ব্যবহার করছে, তারা ঠিকই সত্যকে ধরে ফেলছে। আর যারা অঙ্ক থেকে বের হতেই পারেনা, তারা ওই গোলকধাঁধার মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে।

হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে উপকারী এলম দান করুন। এবং ক্ষতিকর এলম থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

### **গুগল ম্যাপ, জিপিএস, আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও স্যাটেলাইটের ব্যবচ্ছেদ:**

#### **গুগল ম্যাপ কিভাবে কাজ করে?**

আমরা হয়তো জানিনা মাসে ১৫৪ মিলিয়নের উপর ব্যবহারকারী গুগল ম্যাপ ব্যবহার করছে। রাস্তায় চলাচলে থেকে নিয়ে দোকানের নাম, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাসাবাড়ির হোল্ডিং নম্বর পর্যন্ত গুগল ম্যাপে দেখা যায়। তবে ইন্সটেন্ট দেখা যায় না মানে কাজ করে না। যা কাজ করে পূর্বের ধারণকৃত তথ্য।

এখন আসা যাক গুগল ম্যাপ কোথা থেকে কিভাবে তথ্য পায় বা প্রশ্নের মত কীভাবে কাজ করে।

গুগল ম্যাপ উল্লেখযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে বা তথ্যের জন্য নির্ভর করে তার ম্যাপ এর বিষয়বস্তু যোগানদাতার /অংশিদারের উপর।

এইরূপ ৫ রকমের অংশিদারের উপর গুগল ম্যাপ নির্ভরশীল।

**\*Base Map Partners For Geological Maps: বেসম্যাপ**

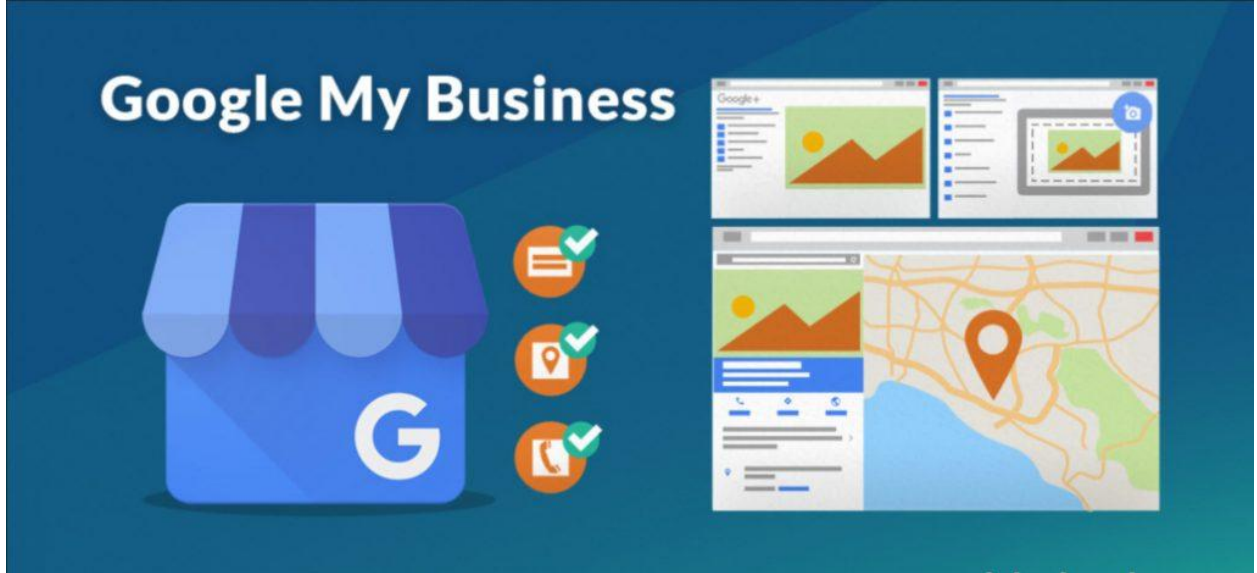
পার্টনার প্রোগ্রাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ভেক্টর ডাটা সংগ্রহ করে, যেমনঃ বন, জাতীয় উদ্যান, রেলওয়ে ও ভূতাত্ত্বিক জরিপ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

**\*Imagery Partners For Aerial Views:** সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত উপগ্রহ ও বিমান থেকে হাই রেজুলেশনের চিত্র সংগ্রহ করে গুগল ম্যাপ ও গুগল আর্থ যোগান দেয়। আরেকটি বিষয় জানি গুগলের কোনো নিজস্ব সেটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ নাই তারা থার্ড পার্টি বা পার্টনারসিপে অর্থ যোগান দেয়।

**Transit Partners:** সরকারী পরিবহন প্ল্যানিং টুল- এটা গুগল ম্যাপকে বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তির রাইড শেয়ারিং এ লোকেশন, সময় ও পরিবহন ভাড়ার পরিকল্পনা করে। সরকারী বাস, ট্রেন ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত। এমনকি উবারের মত ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানিগুলো। বর্তমানে অন লাইন বিত্তিক অনেক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে ও গুগল ম্যাপ সেবা দিচ্ছে। এই জন্য রেজিস্ট্রেশনের সময় লোকেশন চাওয়া হয়।

**\* Individual Partners:** গুগল স্মার্ট ফোন থেকে তার অ্যাপের মাধ্যমে লোকেশন, সঠিক সময়, দূরত্ব, রাস্তা, রাস্তার যানজট, বিকল্প রাস্তা বিশ্লেষণ করে তার ব্যবহারকারীদের তথ্য দেয়।

\* **Google My Business:** মাই বিজিনেসে নিবন্ধন করতে গুগল ম্যাপে বিজ্ঞাপন দেয়া। এই বিজ্ঞাপনগুলোতে কার্যকর ঠিকানা অন্তর্ভুক্ত থাকে। ঠিকানাগুলো প্রতিদিন হালনাগাদ করে ও ব্যবহারকারীর তাৎক্ষণিক চাহিদা নিশ্চিত করে।



ইহাছাড়া ও গুগল তার নিজস্ব যানবাহন দিয়ে বিভিন্ন স্থানে টহল দেয়া। ফলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত রাস্তা, এলাকাগুলো ও আবাসিক ভবনের চিত্র ডিজিটাল ক্যামেরায় বৃত্তাকারে ধারণ করে ব্যবহারকারীকে তথ্য প্রদান করে। এইভাবে গুগল ম্যাপ কাজ করে।

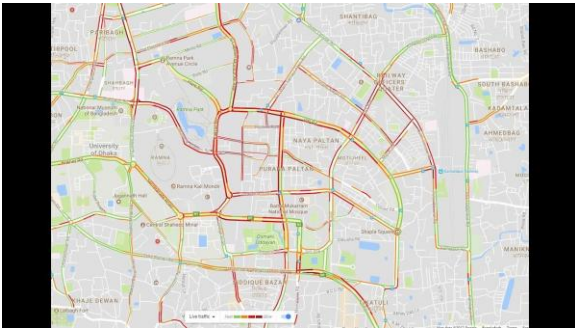
+++++

প্রশ্ন হচ্ছে কোন রাস্তায় জ্যাম আর কোন রাস্তা ফাঁকা- গুগল কীভাবে সেটি বের করে? গুগল সে খবর বের করতে “ক্রাউড সোর্সড ডাটা” ব্যবহার করে থাকে। অর্থাৎ রাস্তায় যত মানুষ যানবাহনে চলাচল করছে তাদের স্মার্টফোনে যদি লোকেশন সার্ভিস অন করা থাকে তাহলে গুগল সেগুলো থেকে ট্রাফিকের ডাটা সংগ্রহ করে ইন্ডিকেটর তৈরি করে। এর মাধ্যমে গুগল রাস্তায় থাকা গাড়ির সংখ্যা,

কত দ্রুত গাড়িগুলো চলছে সেগুলো হিসেব করে জানিয়ে দেয় জ্যামের  
খবারখবর।

## গুগলের লাইভ ট্র্যাফিক আপডেট যেভাবে কাজ করে

গত সপ্তাহে ঢাকায় চালু হয়েছে গুগল ম্যাপের লাইভ ট্র্যাফিক আপডেট সুবিধা।  
কোন রাস্তায় কতক্ষণ জ্যামে বসে থাকতে হবে তা গুগল ম্যাপে দেখা যাবে নতুন  
এই ফিচারটির মাধ্যমে। এমনকি আপনার আশেপাশের রাস্তায় যদি হঠাত জ্যাম  
বেড়ে যায়, তখন গুগল ম্যাপস স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ফোনে নোটিফিকেশন দেখাবে যে  
আপনার কাছাকাছি ট্র্যাফিক জ্যাম বেড়ে গিয়েছে। ঢাকায় গুগল ম্যাপস ওপেন  
করলেই রাস্তার তাৎক্ষণিক ট্র্যাফিক স্ট্যাটাস দেখা যাচ্ছে। তো, কীভাবে কাজ  
করে গুগল ম্যাপের এই ফিচারটি? কোথা থেকে গুগল এই লাইভ ট্র্যাফিক  
আপডেট পায়?



গুগলকে লাইভ ট্র্যাফিক ডেটা দেয়ার জন্য আপনি আমি অনেকেই আছি।  
আমাদের ফোন থেকেই গুগল এই জ্যামের খবর পায়। কি, অবাক হচ্ছেন? অবাক  
হওয়ারই কথা। কিন্তু ঘটনা সত্যি। যেসব এন্ড্রয়েড ফোনে লোকেশন সার্ভিস বা

জিপিএস চালু করা থাকে, সেগুলো থেকে গুগল অ্যানোনিমাস রিয়েল-টাইম ট্র্যাফিক ডেটা সংগ্রহ করে। আর যাদের আইফোন আছে, তারা যখন গুগল ম্যাপস ব্যবহার করেন তখন তাদের কাছ থেকেও লাইভ ট্র্যাফিক ডেটা পায় গুগল।

চলতি পথে আপনি যদি জিপিএস/লোকেশন সার্ভিস চালু রাখেন, তবে আপনার চলার গতি এবং কতক্ষণ পর পর কোথায় কোথায় থামছেন তা বুঝতে পারে গুগল। এভাবে আপনার ঐ একই পথে অন্যান্য ব্যবহারকারীদের ফোন থেকেও লাইভ ডেটা নিয়ে গুগল ম্যাপস সেখানকার তাৎক্ষণিক ট্র্যাফিক স্ট্যাটাস প্রায় নির্ভুলভাবে অনুমান করে ম্যাপে উপস্থাপন করে।

গুগল শুধু আপনার-আমার কাছ থেকেই ডেটা নেয়না। রাইড শেয়ারিং অ্যাপ যেমন উবার, পাঠাও প্রভৃতি গুগল ম্যাপস নির্ভর সেবা থেকেও আরও নির্ভুল এবং রিয়েল-টাইম ট্র্যাফিক ডেটা পায় এই ওয়েব জায়ান্ট। এর ফলে লাইভ ট্র্যাফিক আপডেট ছাড়াও গুগল কোনো এলাকার দীর্ঘমেয়াদি ট্র্যাফিক প্যাটার্ন বুঝে সে অনুযায়ী পূর্বাভাস দিতে সক্ষম, যে কোন দিনের কোন সময়ে উক্ত এলাকায় জ্যাম কম/বেশি থাকে। তবে আপনি যদি গুগলকে রিয়েল-টাইম ট্র্যাফিক ডেটা না দিতে চান, তাহলে ফোনের লোকেশন সার্ভিস/জিপিএস বন্ধ করে রাখতে হবে। অবশ্য সকল ব্যবহারকারী এটা করলে লাইভ ট্র্যাফিক আপডেটের নির্ভরযোগ্যতা কমে যাবে, কারণ তখন আর গুগল এত এত রিয়েল-টাইম ডেটা পাবেনা।

জেনে রাখা ভাল, গুগল ম্যাপে রাস্তায় লাল দাগ দেখানোর মানে হচ্ছে জ্যাম, কমলা রঙের দাগ দেখলে বুঝতে হবে মাঝামাঝি জ্যাম, এবং সবুজ দেখলে বুঝে



নেবেন কোনো জ্যাম নেই। লাল রঙের মাত্রা বেশি মানেই বেশি সময় ধরে আপনাকে জ্যামে বসে থাকতে হবে (যদি পায়ে হেঁটে যান, সেটা ভিন্ন কথা)।

### গুগল মানচিত্রে ফিলিস্তিনকে ইসরাইলের অংশ দেখানো হচ্ছে কেন?

গত কিছুদিন ধরে ফেসবুকে এক তর্ক-বিতর্ক বেশ নজরে আসছে, যার সারাংশ হলো, "গুগল ম্যাপ তাদের ডাটাবেজ থেকে ফিলিস্তিনকে মুছে ফেলেছে", ফলে কেউ যদি ম্যাপে 'Palestine' লিখে সার্চ করে, তাহলে কিছু খুঁজে পাবে না। বিষয়টা ইন্টারেস্টিং লাগলো। তাই সাথে সাথেই মোবাইল বের করে চেক করে দেখলাম, ঘটনা সত্যিই! এবার একটু নড়েচড়ে বসলাম, কারণ এমনটা হলে এর পেছনে সুস্পষ্ট কারণ কিংবা ব্যাখ্যা থাকা উচিত। নেটে ঘাঁটলাম, আর এই ব্যাপারে গুগলের বিবৃতিও পেয়ে গেলাম।



প্রথমেই প্রশ্ন হলো, প্যালেস্টাইন কি কখনও গুগল ম্যাপে ছিল? উত্তর হলো "না"! হ্যাঁ, প্যালেস্টাইন আসলে কখনোই গুগল ম্যাপে ছিল না। আর এই যে

বিতর্ক আজকে নজরে আসলো, সেটাও আসলে এখনে না, ৪ বছর আগের, নতুন করে আগুনে ঘি পড়েছে আর কী! সেই বিতর্কের জের ধরে তখন সোশ্যাল মিডিয়ায় #PalestineIsHere হ্যাশট্যাগও বেশ জনপ্রিয়তা পেয়ে যায়।

আপনি নিজে যদি গুগল ম্যাপে 'Palestine' লিখে সার্চ করেন, কেবল কিছু আউটলাইনই দেখতে পাবেন, আর কিছুই না। 'Israel' লিখে সার্চ করেন, ঠিকই খুঁজে পাবেন। জাতিসংঘের সদস্য ১৩৮টি দেশ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে, যার ভেতরে আছে আমাদের দেশও; ওদিকে ৪৮টি দেশ কিন্তু এখনও দেয়নি, যেসবের মাঝে আমেরিকা, জাপান, জার্মানি, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ আরও অনেক দেশই আছে।

২০১৬ সালে এই বিতর্ক শুরুর পর গুগলের পক্ষ থেকে এক বিবৃতি দেয়া হয়, যেখানে বলা হয়, "গুগল ম্যাপে 'Palestine' নামে কোনো লেবেলই কোনোদিন ছিল না। তবে একটি বাগের কারণে 'West Bank' ও 'Gaza Strip' এর লেবেল চলে গিয়েছে। আমরা কাজ করছি যেন যত দ্রুত সম্ভব এই সমস্যার সমাধান করা যায়।"

ফলে "গুগল ম্যাপ কি আসলেই ফিলিস্তিনকে মুছে দিয়েছে?" বিতর্কের উত্তরে একটা কথাই বলা যায়, "গুগল ম্যাপের কাছে ফিলিস্তিন তথা 'Palestine' নামে কোনো দেশের অস্তিত্বই নেই!"

তবে এমন বিতর্কে গুগল যে এবারই প্রথম জড়িয়েছে তা না, বরং এর আগেও বিভিন্ন দেশের সাথে এমনটা হয়েছে, আর সেসব ক্ষেত্রে গুগল এমন পলিসি নিয়েছে যাতে সব পক্ষকেই সন্তুষ্ট করা যায়!

১) কাশ্মীর ইস্যুতেই আসা যাক। ভারত থেকে কেউ কাশ্মীর লিখে গুগল ম্যাপে সার্চ করলে সেটাকে ভারতের অংশ হিসেবেই দেখতে পাবে, যেখানে থাকবে সলিড লাইন। ওদিকে পাকিস্তান বা অন্য কোনো দেশ থেকে সার্চ করলে গুগল একই অঞ্চলকে দেখায় ডটেড লাইন দিয়ে, যার মানে এই অঞ্চল নিয়ে বিতর্ক আছে।

২) ২০১০ সালে গুগল ম্যাপে ত্রুটির কারণে নিকারাগুয়া আর কোস্টা রিকার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে দুই দেশের সশস্ত্র বাহিনী একেবারে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়েই এসেছিল। ভার্গিউস সব বুঝে গুগল ইউএস সেট ডিপার্টমেন্ট থেকে আপডেট তথ্য নিয়ে নিজেদের ভুল শুধরে নেয়।

৩) ক্রিমিয়া নিয়ে বিবাদ চলমান রাশিয়া আর ইউক্রেনের মাঝে। এজন্য ইউক্রেনে অবস্থানরত কেউ ক্রিমিয়া লিখে সার্চ করলে গুগল অঞ্চলটিকে ইউক্রেনের অন্তর্গত দেখায়। ওদিকে রাশিয়া থেকে কেউ সার্চ করলে ক্রিমিয়াকে ভিন্ন দেশ হিসেবে দেখে। আর আমরা বাকি বিশ্ববাসী একে দেখতে পাই ডটেড লাইনে ঘেরা এলাকা হিসেবে, যার মানে এই অঞ্চল নিয়েও ঘাপলা আছে।

৪) ভারতের অরুণাচল প্রদেশের নাম শুনে থাকার কথা, যে অঞ্চলটি নিয়ে বিতর্ক আছে ভারত আর চীনের। ভারত এই অঞ্চলকে তাদের একটি প্রদেশ বলে দাবি করলেও চীন বলে এটা তাদের দক্ষিণ তিব্বতের অংশ। ফলে কোনো ঝামেলায় না

গিয়ে এখানেও গুগল ম্যাপ দুই দেশের অধিবাসীদের আগের মতোই সন্তুষ্ট করে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাপে এটাকে ডটেড লাইনে দেখিয়ে রেখেছে।

৫) একবার তো তাইওয়ানকে 'চীনের প্রদেশ' উল্লেখ করে তাইওয়ানের পক্ষ থেকে ভালোই সমালোচিত হয় গুগল। পরে যখন এটা সরিয়ে নেয়া হয়, তখন আবার ক্ষেপে যায় চীন!

ফিলিস্তিনের নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষগুলো তাদের যাবতীয় অধিকার ফিরে পাক, ফিলিস্তিন একটি দেশ হিসেবে ফিরে পাক তার যাবতীয় অধিকার, অবসান ঘটুক ইসরায়েলি দখলদারিত্বের- এই প্রত্যাশাই করব দিন শেষে।

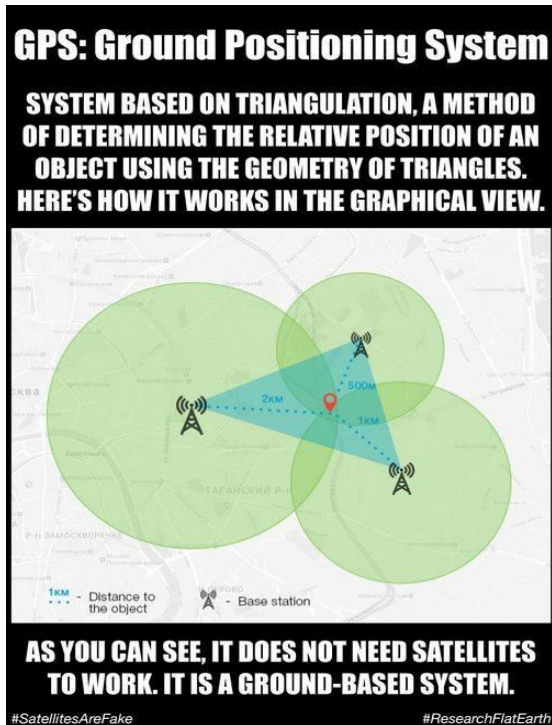
সংযোজন: গুগল ম্যাপের উপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখাটা একপ্রকার বোকামি। এটার ভিতরে প্রচুর ঘাপলা ও ভুল আছে। আপনি এসব নিয়ে ঘাটাঘাটি করলেই সব জানতে পারবেন। আর এই ম্যাপ সব জায়গায় কাজ করে না। এখনই আপনি চেষ্টা করে দেখুন। তিব্বতের কিছুই আপনি দেখতে পাবেন না। এরকম অনেক জায়গা আছে যেখানে গুগল ম্যাপ দিয়ে প্রবেশ করা যায় না। আকাশের স্যাটেলাইট থেকেই যদি হতো, তাহলে তো যে কোনো দেশে যে কোনো মুহূর্তেই প্রবেশ করা যেত। এছাড়াও অনেকেই গুগল ম্যাপকে অনুসরণ করে ভ্রমণ করতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে।

আসল কথা হলো ওরা সব কিছুকে কৌশলে অনলাইন ভিত্তিক করে এখন যা ইচ্ছা তাই করার একটা সুযোগ পেয়ে গেছে।

**জি পি এস কিভাবে কাজ করে?**

আপনার ফোনে যে জিপিএস চিপটি আছে সেটা হচ্ছে জিপিএস সিগন্যাল রিসিভার। এটা জিপিএস স্যাটেলাইট থেকে আগত সিগন্যাল ধরতে পারে। এই রিসিভার চিপ কোনো তথ্য ট্রান্সমিট করে না বা স্যাটেলাইটের (?) নিকট প্রেরণ করেনা।

একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি ক্লিয়ার হবে। ধরা যাক, আপনার বন্ধু আপনাকে ফোনে জানালো যে সে জাতীয় সংসদ ভবন এর গেইট থেকে সরাসরি ১ কিলোমিটার দূরে আছে (বা কিছু বেশি)। শুধুমাত্র এতটুকু শুনলে আপনি কিন্তু কোনো ভাবেই জানবেন না সে আসলে কোথায় আছে। কারণ সে সংসদ ভবন থেকে যে কোনো দিকে ১ কিলোমিটার দূরে থাকতে পারে। তার মানে, সংসদ ভবনের চারপাশে যদি ১ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের একটি বৃত্ত কল্পনা করা হয় তাহলে সে বৃত্তের পরিধি বরাবর যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে।

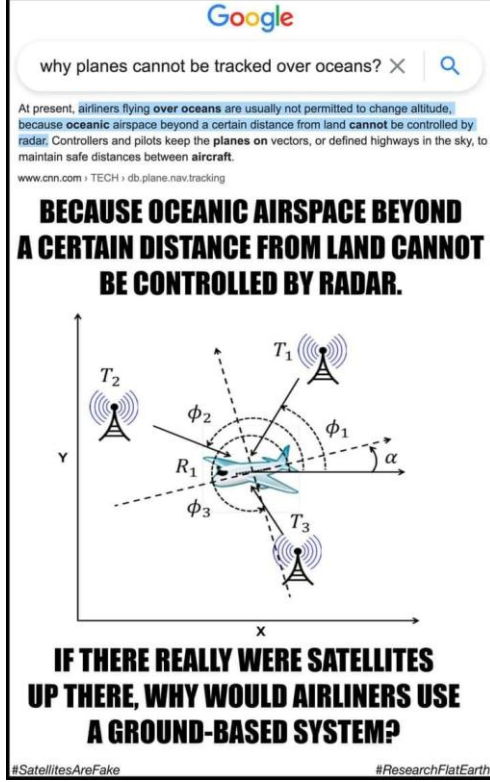


এবার যদি সে বলে যে সে একই সাথে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকেও দেড় কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থান করছে তাহলে কি হবে? তাহলে আপনার কাছে তার অবস্থান আরেকটু ক্লিয়ার হয়ে যাবো। এবার আপনি যদি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কেন্দ্র করে ১.৫ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের বৃত্ত কল্পনা করেন তাহলে দেখবেন যে এই বৃত্তটি আগের বৃত্তটিকে দুটি বিন্দুতে ছেদ করেছে। তার মানে আপনার বন্ধু এই দুই বিন্দুর কোন একটিতে আছে। তাও কিন্তু আপনি আপনার বন্ধুর লোকেশন পেলেন না।

এবার যদি আপনার বন্ধু আপনাকে বলে যে সে তেজগাঁও রেল স্টেশন থেকেও সোজাসুজি ৫০০ মিটার দূরত্বে আছে তাহলে? তাহলে আপনার কাজ হয়েই গেলো। এবার তেজগাঁও রেল স্টেশনকে কেন্দ্র করে ৫০০ মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্ত কল্পনা করলে দেখবেন যে তিনটি বৃত্তই একটি মাত্র সাধারণ বিন্দুতে ছেদ করেছে। আর সেই ছেদবিন্দুটি হলো ফার্মগেট বাস স্টপ। আর আপনার বন্ধু আসলে ফার্মগেট বাস স্টপেই আছে। মজার না ব্যাপারটা? এই হিসেবটিকে বলা হয় ট্রাইল্যাটারেশন।

জিপিএসও এই নীতিতেই কাজ করে। আপনার ফোনের জিপিএস চিপটি একই সাথে ৩-৪টি জিপিএস স্যাটেলাইট থেকে নিজের দূরত্ব নির্ণয় করে নেয়। সাধারণত তিনটি জিপিএস স্যাটেলাইটের সিগন্যাল নিয়েই উপরের উদাহরণের মতো আপনার লোকেশন বের করে ফেলে আপনার ফোনটি। এভাবে যত বেশি স্যাটেলাইটের সিগন্যাল পাবে আপনার লোকেশনও তত বেশি এক্যুরেট পাবেন। খোলা আকাশের নিচে এই সিস্টেম সবচেয়ে ভালো কাজ করে, কারণ স্যাটেলাইট সিগন্যাল পেতে তখন সুবিধা হয়।

**N:B:** (এটা আকাশে ঘূর্ণায়মান স্যাটেলাইট নয়, বরং পৃথিবীতে থাকা বিভিন্ন নেটওয়ার্ক টাওয়ার। মোবাইল টাওয়ারও হতে পারে উপরোক্ত আলোচনা থেকে তো, তা স্পষ্টই হয়ে গেলো )



আমেরিকা যদি জিপিএস বন্ধ করে দেয়?

জিপিএস হলো লোকেশন নির্ণয় করার একটা সিস্টেম মাত্র। জিপিএস ছাড়াও লোকেশন জানার অন্যান্য বিকল্প পদ্ধতি আছে। তবে ওইগুলো বেশি প্রচলিত না, আবার জিপিএসের মতো এতো শক্তিশালীও না।

জিপিএস এর মালিক হলো যুক্তরাষ্ট্র সরকার। যদিও তারা এটা সারা পৃথিবীর জন্য উন্মুক্ত করে রেখেছে, কিন্তু তারা চাইলেই (হতে পারে যুদ্ধ বিগ্রহের মতো পরিস্থিতিতে) এটা বন্ধ করে দিতে পারে।

তাই রাশিয়া এরকম জিপিএসের মতো সিস্টেম ডেভেলপ করেছে যার নাম দিয়েছে তারা **GLONASS**। আজকাল স্মার্টফোনের স্পেসিফিকেশনে দেখতে পাবেন

**Location: A-GPS with GLONASS**। এর মানে হচ্ছে ফোনটি আমেরিকার জিপিএস ও রাশিয়ার গ্লোনাস উভয় সিস্টেমেই লোকেশন বের করতে পারে।

এছাড়া চীন বিডিএস নামে ও ইউরোপ গ্যালিলিও নামে তাদের নিজস্ব পজিশনিং সিস্টেম নিয়ে কাজ করছে।

সংযোজন: আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন, এতদিন ধরে আমরা যে আকাশের স্যাটেলাইট নিয়ে কল্পকাহিনীর মধ্যে ডুবে ছিলাম, তার সবকিছুই জমিন থেকেই হয়। শুধুমাত্র আই ওয়াশের জন্য কিছু বেলুন আর ড্রোন স্যাটেলাইট মাঝে মাঝে তারা উড়িয়ে দেয়।

### আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

আবহাওয়া জানার এই পদ্ধতিকে বলা হয় **Weather**

**forecasting**। মানবজাতি বহুকাল আগে থেকেই আশেপাশের

আবহাওয়া নিয়ে কৌতূহলী ছিল তবে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে

আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টা মূলত ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু



হয়েছে। ১৮৩৫ সালে ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের পরেই আধুনিক ফোরকাস্টিংয়ের যাত্রা শুরু হয়। প্রাচীনকালে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হতো আকাশের মেঘ, বাতাসের গতিবিধি আর তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ করে।

তবে ইলেকট্রনিক টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের পর যে দুইজন মানুষ আবহাওয়ার পূর্বাভাসকে বৈজ্ঞানিক রূপদান করেন তারা হলেন ব্রিটিশ রয়্যাল নেভির অফিসার ফ্রান্সিস বেউফোর্ট আর তার সহযোগী রবার্ট ফিজরয়। অদ্ভুত ব্যাপার হলো এটা নিয়ে তারা যখন গবেষণা করছিলেন তখন মিডিয়াতে তাদেরকে নিয়ে অনেক হাসাহাসি করা হয়। আর আজ তাদের কল্যাণেই মিডিয়া আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে পারছে !

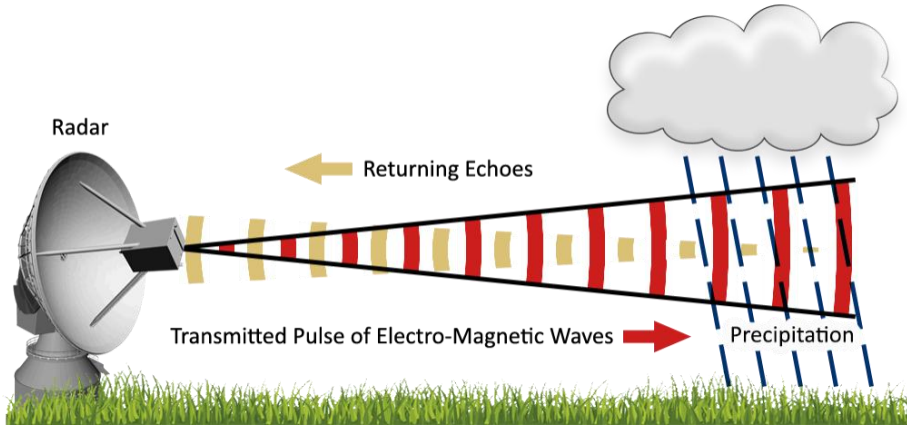
প্রথম দিকে মূলত নৌবাহিনীর জাহাজে ঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য কাজ করলেও বর্তমানে সাধারণ মানুষদের দৈনন্দিন কাজেও এটি ব্যবহৃত হয়। তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলেই সকলের কাছে আবহাওয়ার খবর পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস করা হয় তাকে

বলে Numerical Weather Forecasting। ১৯২২ সালে লুইস রিচার্ডসন সংখ্যা-উপাত্তের মাধ্যমে আবহাওয়ার পূর্বাভাসের আধুনিক পদ্ধতি নিয়ে তার বই লিখেন **"Weather Prediction By**

**Numerical Process"**। তবে তার পদ্ধতির জন্য প্রয়োজন ছিল দীর্ঘ হিসাব নিকাশ যা কম্পিউটার ছাড়া তখন করা ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। ১৯৫০ সালে গণিতবিদ জন ভন নিউম্যান প্রথম কম্পিউটারের মাধ্যমে ওয়েদার

ফোরকাস্ট করেন। পরবর্তীতে কম্পিউটারের ক্রমবিকাশের সাথে সাথে এটি আরো সহজ হয়ে উঠতে থাকে।

আবহাওয়াবিদরা পৃথিবীর উপরিভাগকে বিভিন্ন বর্গে ভাগ করে থাকেন। প্রতিটা বর্গের ওপরের বায়ুমণ্ডলকে বক্স বলা হয় আর বায়ুমণ্ডলের বায়ুপ্রবাহ, বায়ুর চাপ, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বিভিন্ন উচ্চতা থেকে পর্যবেক্ষণ করে রেকর্ড করা হয়। সারা পৃথিবীতে প্রায় ৩ হাজারেরও বেশি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র আছে ও সেগুলোর প্রত্যেকটার উপাত্তকে কম্পিউটার বিশ্লেষণ করে ও এর পরের ১৫ মিনিটে বিশ্বের আবহাওয়া কেমন হবে সেই বিষয়ে পূর্বাভাস দেয়। একবার তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়ে গেলে পরের ১৫ মিনিটের আবহাওয়া পূর্বাভাস সম্বন্ধে খুব তাড়াতাড়ি জানা যায়। এই পদ্ধতিটা বেশ কয়েক বার করে একটা কম্পিউটার মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে সারা পৃথিবীর আগামী ছয় দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে পারে।



নিউমেরিক ফোরকাস্টিংয়ের মূল ব্যাপারটা হলো নির্দিষ্ট অঞ্চলের বায়ুর বর্তমান সময়ের বিভিন্ন তথ্য নিয়ে **ফ্লুয়িড ডাইনামিক্স** আর **থার্মোডাইনামিক্সের** সূত্রের

সাহায্যে সেই অঞ্চলের ভবিষ্যতের আবহাওয়া সম্পর্কে অনুমান করা। মনে রাখতে হবে যে, এইগুলোর কোনটিই নিশ্চিত তথ্য নয় বরং **সম্ভাব্য তথ্য**। তাই আবহাওয়া রিপোর্টে বলা হয় না যে “আজ বৃষ্টি হবে” বরং বলা হয় যে **আজ ভারী বা মাঝারি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে**। মাঝে মাঝে আবহাওয়াবিদদের দেওয়া পূর্বাভাসের সঙ্গে অনেক সময় বাস্তবের মিল থাকে না। কখনও কোনো অঞ্চলের জন্য মুষলধারে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিলেও বাস্তবে দেখা যায় সেখানে রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ।

### ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাসের পেছনের বিজ্ঞান

আবহাওয়া পরিমাপ করা

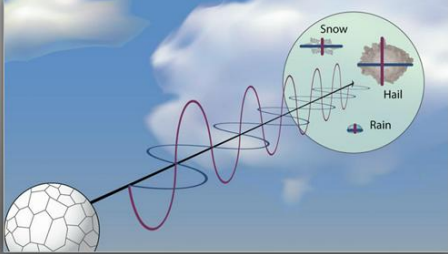

১৬৪৩ সালে ইতালির পদার্থবিজ্ঞানী এভানজেলিস্টা টরিসিলি আবিষ্কার করেন ব্যারোমিটার। আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর চাপ ওঠানামা করে আর চাপ কমে যাওয়া ঝড়ের সঙ্কেত দেয় যন্ত্রটি। বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা পরিমাপের যন্ত্র হাইগ্রোমিটার ১৬৬৪ সালে আবিষ্কৃত হয়। এর প্রায় একশ’ বছর পর ফরাসি বিজ্ঞানী আনটোয়ান-লোরান ল্যাভোঁসিয়ার আবিষ্কার করেন যে- প্রতিদিনের বায়ুর চাপ, আর্দ্রতা এবং বাতাসে গতি ও দিক পরিমাপ করে এক বা দুদিন আগে আবহাওয়া সম্বন্ধে প্রায় সঠিক খবর জানানো সম্ভব।

আবহাওয়ার দিক নির্ণয়

আবহাওয়াবিদরা যত বেশি উপাত্ত সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, ততই তারা বুঝতে পেরেছিলেন আবহাওয়া খুবই জটিল বিষয়। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে অনেক আবহাওয়া কেন্দ্র আছে, যেখান থেকে রেডিয়োসন্ড সংবলিত বেলুন উড়িয়ে দেওয়া হয়। রেডিয়োসন্ড হলো এক ধরনের যন্ত্র, যা দিয়ে বায়ুমণ্ডলের অবস্থা পরিমাপ করা হয় ও তারপর ওই তথ্যগুলোকে রেডিওর মাধ্যমে আবার আবহাওয়াকেন্দ্রে জানিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া রাডার ব্যবহার করা হয়। বেতার তরঙ্গগুলো মেঘে বৃষ্টিকণা ও বরফকণায় আঘাত পেয়ে ফিরে আসে আর আবহাওয়াবিদরা তখন বুঝতে পারেন ঝড় কোনদিকে চালিত হচ্ছে।

**Did You Know...**

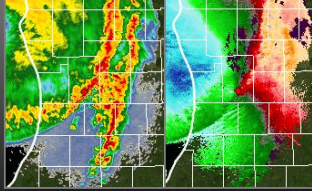
**Radar is short for radio detection and ranging**

Our Doppler radar emits extremely short bursts of radio waves into the atmosphere, then "listens" for a returning signal

If the energy strikes an object (rain drop, bug, bird, etc.), the energy scatters in all directions and a small fraction of that energy is directed back toward the radar

Precipitation areas and motions toward or away from the radar (Doppler effect) can then be detected



[f](#) [t](#) @NWSGrandRapids

**National Weather Service – Grand Rapids, MI**

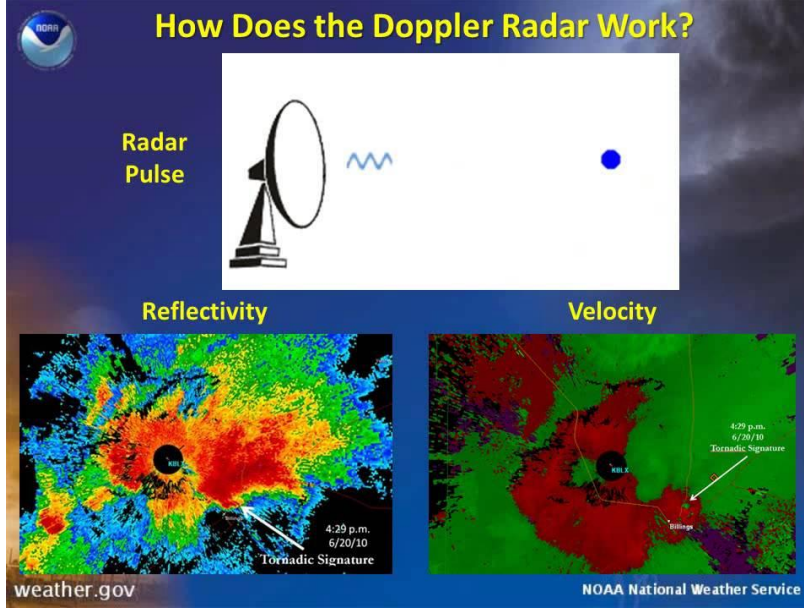
আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পর ব্রিটিশ আবহাওয়াবিদ লুইস রিচার্ডসন অনুমান করেছিলেন, যেহেতু বায়ুমণ্ডল পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলো মেনে চলে, তাই আবহাওয়া সম্বন্ধে আগে থেকে বলার জন্য তিনি গণিতশাস্ত্রকে ব্যবহার

করতে পারেনা। কিন্তু সূত্রগুলো এত জটিল ও গণনা করতে এত সময় লেগে যেত যে, পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য গণনা শেষ করার আগেই আবহাওয়া নির্ধারণের রেখাগুলো উধাও হয়ে যেত। এছাড়া রিচার্ডসন ছয় ঘণ্টা পর পর নেওয়া আবহাওয়ার উপাত্ত ব্যবহার করেছিলেন। ফরাসি আবহাওয়াবিদ রেনে শাবৌ বলেন, সঠিক আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ ৩০ মিনিট পর পর পরিমাপ করা দরকার।

কিন্তু কম্পিউটার আসায় বড় ও জটিল হিসাবগুলো তাড়াতাড়ি করা সম্ভব হয়। আবহাওয়াবিদরা এক জটিল সংখ্যাসূচক নমুনা তৈরি করার জন্য রিচার্ডসনের হিসাব পদ্ধতিকে ব্যবহার করেছিলেন। জটিল সংখ্যাসূচক নমুনাটা হলো এক ধারাবাহিক গাণিতিক সমীকরণ, যার মধ্যে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে এমন সব ভৌত আইন রয়েছে।

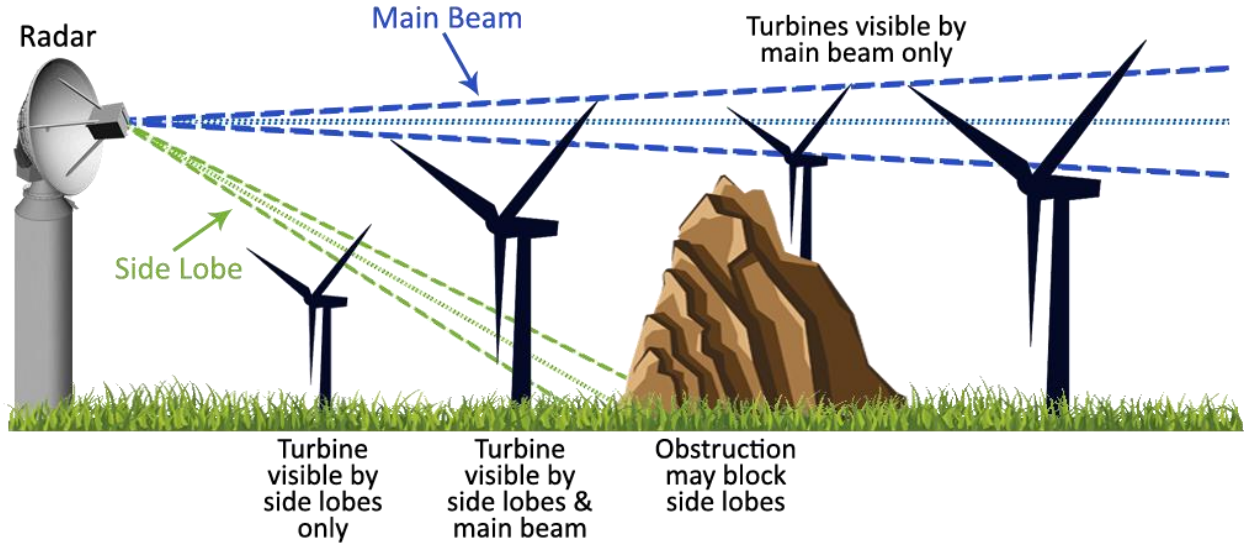
এই সমীকরণগুলোকে কাজে লাগানোর জন্য আবহাওয়াবিদরা পৃথিবীর উপরিভাগকে বর্গজালিতে ভাগ করেন। সম্প্রতি ব্রিটেনের আবহাওয়া অফিস পৃথিবীর যে মডেল ব্যবহার করে তাতে বর্গজালির বিন্দুগুলো প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে দূরে অবস্থিত। প্রতিটি বর্গের ওপরের বায়ুমণ্ডলকে বক্স বলা হয় আর বায়ুমণ্ডলের বায়ুপ্রবাহ, বায়ুর চাপ, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা ২০টি বিভিন্ন উচ্চতা থেকে পর্যবেক্ষণ করে রেকর্ড করা হয়।



সারা পৃথিবীতে সাড়ে ৩ হাজারের বেশি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকেন্দ্র আছে ও সেগুলোর প্রত্যেকটির উপাত্তকে কম্পিউটার বিশ্লেষণ করে ও এর পরের ১৫ মিনিটে বিশ্বের আবহাওয়া কেমন হবে সেই বিষয়ে পূর্বাভাস দেয়া একবার এটা করা হয়ে গেলে পরের ১৫ মিনিটের আবহাওয়ার পূর্বাভাস সম্বন্ধে খুব তাড়াতাড়ি জানা যায়। একটি কম্পিউটার মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে সারা পৃথিবীর আগামী ছয় দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে পারে।

সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস

প্রযুক্তির বিবর্তনে এখন ঘূর্ণিঝড়ের ব্যাপারে অনেক তথ্য জানতে পারছি আমরা। স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং কম্পিউটার মডেলের কল্যাণে ঘূর্ণিঝড়ের ভেতরে কী চলছে তা-ও আমরা জানতে পারি। এসবের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়ার পদ্ধতিও হয়ে উঠেছে অনেক উন্নত। বিশ্ববীয় একটি ঘূর্ণিঝড় কোন পথে যাচ্ছে তা-ও আমরা এখন বুঝতে পারি।



ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস দিতে ব্যবহার হয় বেশ কয়েকটি কম্পিউটার মডেল। এদের একেকটির ক্ষমতার মাঝে রয়েছে বেশ ফারাক এবং একেকটি একেক বিষয়ে পারদর্শী।

বর্তমানে প্রচলিত মডেলগুলো ঘূর্ণিঝড়ের চলার পথের পূর্বাভাস দিতে পারে সঠিকভাবেই। এর জন্য ব্যবহার করা হয় গ্লোবাল ডায়নামিক মডেল। এই মডেলগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য নিয়ে এগুলোকে একটি সমীকরণের মাঝে ফেলা হয় এবং এ থেকে পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু ঘূর্ণিঝড়টি সেখানে গিয়ে পড়ার পর কী তাগুব চালাবে সে সম্পর্কে ভালো কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

কোনো একটি ঘূর্ণিঝড়ের শক্তিমাত্রা পরিমাপ করার জন্য সাধারণত একটু কম আধুনিক, পরিসংখ্যানভিত্তিক মডেলগুলো দিয়ে কাজ চালানো হয়। যে ঝড়টি চলছে তা থেকে তথ্য নিয়ে এটি একটি গড়পড়তা উত্তর দেয়া জানা যায়, ওই অবস্থানে এবং বছরের ওই সময়ে এমন যেকোনো ঝড়ের

শক্তি কেমন হতে পারে। এই মডেলগুলো সহজে কাজ করে এবং সময়ও কম লাগায়। কিন্তু সমস্যা এখানেই যে, এদের পূর্বাভাসগুলো হয় দুর্বল।

এ ছাড়া খুব হাই-টেক মডেলে আছে এবং এগুলো ব্যবহার করে অনেক তথ্য কিন্তু ফলে এগুলো হয়ে যায় ভীষণ শ্লথগতির। একটি ঝড়ের ফলে যখন মানুষের জীবন ঝুঁকির মুখে পড়েছে তখন এতটা সময় আসলে পাওয়া যায় না এবং বাধ্য হয়েই কম সময়ে পূর্বাভাস দিতে হয় আবহাওয়াবিদদের।

এ ছাড়া ঘূর্ণিঝড়ের সঠিক পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে আরেকটি বাধা হলো- ঘূর্ণিঝড় ঠিক কীভাবে কাজ করে তা এখনো আমাদের কাছে রহস্য। যেমন আমরা জানি যে, ঘূর্ণিঝড়ের ঠিক মাঝে রয়েছে এর কেন্দ্র বা ‘চোখ’ এবং ঘূর্ণিঝড় যখন তাগুব চালায় চারদিকে তখন এই চোখের ভেতরের স্থান থাকে আশ্চর্য রকমের শান্ত। কিন্তু সম্প্রতি জানা গেছে, এই চোখকে বাইরের অশান্ত পরিবেশ থেকে রক্ষা করে যেই বাতাসের দেয়াল তা নিরবচ্ছিন্ন নয় এবং এটি ভেঙে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই আবার নতুন করে গঠিত হতে পারে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে প্রভাব পড়তে পারে ঘূর্ণিঝড়ের শক্তির ওপর। এই ঘটনাটি কখনো ঘূর্ণিঝড়কে করে ফেলে দুর্বল, আবার কখনো তাকে করে তুলে আরো বিধ্বংসী। এ রকম আকস্মিক বিষয়গুলোকে মডেলের ভেতরে আনা সম্ভব নয় এবং এগুলোর ফলে সৃষ্ট তারতম্যও তাই রয়ে যায় হিসাবের বাইরে। এসব কারণে শত হিসাব-নিকাশ সত্ত্বেও দেখা যায় পূর্বাভাসগুলো অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে যায় ভুল। ঘূর্ণিঝড়গুলোকে আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য তাই মানুষ এবার দূর থেকে জল্পনা-কল্পনা বাদ দিয়ে বিমান নিয়ে যাচ্ছে ঠিক এর মধ্যভাগে এবং এই কাজগুলো



আরো ভালোভাবে করা গেলে হয়তো ভবিষ্যতে আকস্মিক ঘূর্ণিঝড়ের ফলে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রাও কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।



সংযোজন: উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই বুঝা গেলো যে, আবহাওয়ার পূর্বাভাসের সাথে কথিত স্যাটেলাইটের কোনো সম্পর্ক নেই। একটি বেলুন বা ড্রোন স্যাটেলাইট হয়তো পাঠায় কিছু তথ্য ও ছবি পাওয়ার জন্য। কিন্তু এটা থেকে কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান স্যাটেলাইটকে প্রমাণ করা যায় না।



**কৃত্রিম বৃষ্টি (Artificial Rain)**

বৃষ্টিপাতের জন্য প্রথমেই দরকার পড়ে জলীয় বাষ্প, সেই জলীয় বাষ্প হালকা হওয়ার কারণে উপরে উঠে গিয়ে বাতাসের ধূলিকণা, বালুর কণা ইত্যাদির সহায়তায় জমাটবদ্ধ হয়ে তৈরি করে মেঘ। এভাবে মেঘের আকৃতি বড় হতে হতে যখন ভারি হয়ে যায়, তখন হয় বৃষ্টি। এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াটিকে মানবনিয়ন্ত্রিত পন্থায় করাকেই বলা হচ্ছে কৃত্রিম বৃষ্টিপাত। কৃত্রিম বৃষ্টিপাতে, কখনও পুরো প্রক্রিয়াটি, কখনও তার আংশিক (জলীয় বাষ্পকে মেঘে রূপান্তর) নিয়ন্ত্রণ করা হয়। পুরো প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রথমে দ্রুতগতির বড় পাখা দিয়ে কোনো জলক্ষেত্রের পানিকে বাষ্পীভূত করা হয়। হালকা সেই বাষ্প উপরে উঠে গিয়ে বাতাসের ধূলিকণার সাথে মিশে জমাট বাঁধে। তবে এই জমাট বাঁধানোর ব্যাপারটিও কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সিলভার আয়োডাইডের কণা ছুঁড়ে দিয়ে। এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক কিংবা কৃত্রিমভাবে তৈরি জলীয় বাষ্পকে জমানোর জন্য বন্দুক কিংবা রকেট ব্যবহার করে ভূমি থেকে উপরের দিকে, কিংবা বিমান ব্যবহার করে আকাশ থেকে ভূমির দিকে সিলভার আয়োডাইডের কণা ছড়িয়ে দেয়া হয়। উষ্ণ অঞ্চলে একাজে ব্যবহার করা হয় ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড। এভাবে জমাটবদ্ধ জলীয় বাষ্প বা মেঘ যখন ভারি হয়ে যাবে, তখন ঐ স্থানে ঝরে পড়বে মেঘ, হবে বৃষ্টি। কৃত্রিম বৃষ্টির এই প্রক্রিয়া যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ।

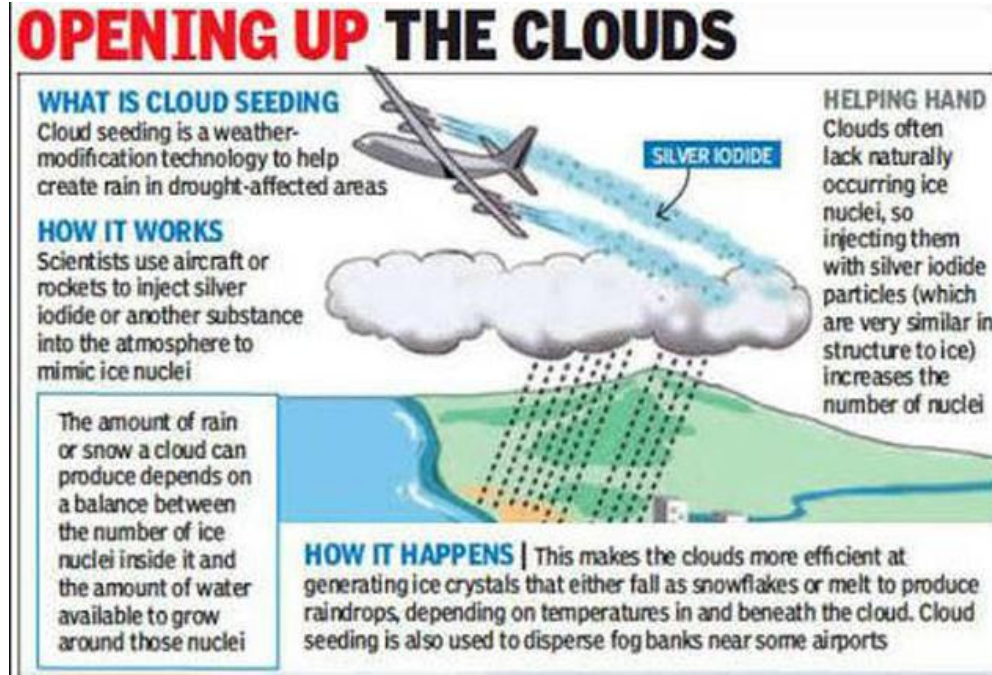
## Cloud Seeding & Artificial Rain



কৃত্রিম বৃষ্টির কথা প্রথম ভেবেছিলেন মার্কিন বিজ্ঞানী ভিনসেন্ট শায়েফার। তিনি বাতাসের জলীয় বাষ্পকে জমাট বাঁধিয়ে মেঘ বানাতে ব্যবহার করেছিলেন জমাট বাঁধা কার্বন ডাইঅক্সাইডের টুকরা (ড্রাই আইস: Dry Ice)। তিনি বার্কশায়ার পাহাড়ের কাছে ড্রাই আইস ছুঁড়ে দিয়ে তুলোর মতো মেঘ বানাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তাঁকেই কৃত্রিম মেঘের জনক বলা হয়ে থাকে।

কৃত্রিম বৃষ্টি, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আশার বাণী নিয়ে এসেছে। সবচেয়ে বেশি উপকৃত হচ্ছে চীনা। চীনের উত্তর অংশে বৃষ্টিপাত সাধারণ খুব কম হয়। পানির অন্যান্য উৎসগুলোর অবস্থাও ভয়াবহ খারাপ। তাই কৃত্রিম বৃষ্টি কাজে লাগিয়ে তারা ইচ্ছামতো বৃষ্টি ঝরিয়ে নদ-নদীর পানি ১৩% পর্যন্ত বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। ২০০৮ বেইজিং অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে বৃষ্টিমুক্ত রাখতেও কাজে লাগানো হয় এই কৃত্রিম বৃষ্টির পদ্ধতি। কিন্তু কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া আছে কিনা, তা এখনও সন্দেহের অতীত নয়। বেইজিংয়ের প্রতিবেশী অঞ্চলগুলো অভিযোগ এনেছে

যে, এই প্রক্রিয়ায় তাদের বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প টেনে নেয়া হচ্ছে। যথেষ্ট কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের এই ব্যবস্থা বৈশ্বিক উষ্ণায়নও ঘটাতে পারে বলে অনেকে মনে করেন।



**N:B: জড় পদার্থ দাজ্জালের ডাকে সাড়া দেবে**

নবী বলেন “দাজ্জাল এক জনসমাজে গিয়ে মানুষকে তার প্রতি ঈমান আনয়নের আহ্বান জানাবো। এতে তারা ঈমান আনবে। দাজ্জাল তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করার জন্য আকাশকে আদেশ দিবে। আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে, যমিন ফসল উৎপন্ন করবে এবং তাদের পশুপাল ও চতুষ্পদ জন্তুগুলো অধিক মোটা-তাজা হবে এবং পূর্বের তুলনায় বেশি দুধ প্রদান করবে। অতঃপর অন্য একটি জনসমাজে গিয়ে মানুষকে তার প্রতি ঈমান আনয়নের আহ্বান জানাবো। লোকেরা তার কথা প্রত্যাখান করবে। দাজ্জাল তাদের নিকট থেকে ব্যর্থ হয়ে ফেরত আসবে। এতে তারা চরম অভাবে পড়বে। তাদের ক্ষেত-খামারে চরম ফসলহানি দেখা দিবে। দাজ্জাল পরিত্যক্ত ভূমিকে তার নিচে লুকায়িত গুপ্তধন বের করতে বলবে। গুপ্তধনগুলো বের হয়ে

মৌমাছির দলের ন্যায় তার পিছে পিছে চলতে থাকবে”। (সহীহ মুসলিম-কিতাবুল ফিতান)

### স্যাটেলাইট থিওরি: বাস্তব ও সঠিক তথ্য জেনে নিন।

মডার্ন সাইন্স প্রতিষ্ঠিতই থিওরির উপর। বিগ ব্যাং থিওরি, থিওরি অব ইভলিউশন, থিওরি অব গ্রাভিটি, রিলেটিভিটি থিওরি, কোয়ান্টাম থিওরি, এটমিক থিওরি ইত্যাদি ইত্যাদি এই থিওরি রাজ্যে স্যাটেলাইট থিওরিরও জায়গা পাবে।

তরল ও বায়বীয় মিডিয়ামে বস্তুর প্লবতা নির্ভর করে মিডিয়াম সাপেক্ষে তার ডেনসিটির উপর। মিডিয়াম থেকে অবজেক্টের আয়তন বাড়া সাথে সাথে ঘনত্ব যত কমতে থাকবে প্লবতা তত বেশি হতে থাকবে। মার্কারির চেয়ে লোহার Density কম বলে লোহা মার্কারিতে ভাসে[5]। আবার বায়ুর চেয়ে H, He-র ঘনত্ব কম বলে H, He ভর্তি বেলুন উপরে উঠে। সবচেয়ে কম মানে zero density হলো ভ্যাকুয়াম। ফুলানো অবস্থায় যদি বেলুনের ভিতর ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি করা যায় তাহলে এর density সর্বোচ্চ হবে। অনেকে হয়তো ভাবছেন, ফুলানো অবস্থায় আবার ভিতরে zero density বা ভ্যাকুয়াম কিভাবে তৈরী সম্ভব! একটু explain করলেই বুঝে আসবে।





"আমরা বায়ুর সমুদ্রে ডুবে আছি" ছোট বেলায় এটা আমরা সকলেই পড়েছি। সী লেভেলে এয়ার পেশার  $14.70\text{kg/inch}^2$  [1] যা বাস্তবিক ভাবেই অনেকটা চাপ। এই চাপে বেলুনের মত হালকা বস্তুর ভিতরটা ভ্যাকুয়াম করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু যদি কোন শক্ত স্ট্রাকচার তৈরী করে বেলুনের ভিতর রাখা যায় যা একই সাথে হালকা ও এয়ার পেশার সহ্য করতে পাড়বে তাহলে অলমোস্ট জিরো ডেনসিটির জন্য তা কোন রকম জ্বালানি ছাড়া উড়তে থাকবে। আগেই বলেছি অবজেক্টের ঘনত্ব যত কমবে এবং এরিয়া যত বাড়বে buoyancy ততো বাড়বে। একটা  $10*10*10$  মিটার অবজেক্টকে ভ্যাকুয়াম করলে নির্দিধায় বাস বা হাতি উড়িয়ে নিতে সক্ষম।

এখন লার্জ রেঞ্জে চিন্তা করুন। একটা শক্তপোক্ত হালকা অবজেক্ট নির্বাচন করে সেটা দিয়ে একটা নিশ্চিহ্ন, ফাপা স্ট্রাকচার তৈরী করে অবজেক্টের ভিতকার সব বায়ু সড়িয়ে ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি করা হলে তা বায়ু ভেদ করে উপরের উটে বায়ু স্তরে ভেসে থাকবে। সমুদ্রর বাতাস ভর্তি বোতল ছেড়ে দিলে যেভাবে ভেসে উঠে অনেকটা তেমন।



এখন হয়তো অনেকেই চিন্তা করছে শক্তপোক্ত তবে হালকা অবজেক্ট আদৌ আছে তো? সমুদ্র তলে বায়ুর চাপ অত্যাধিক বেশি হওয়ায় কাঠামো ঠিক রেখে ভিতরে ভ্যাকুয়াম বজায় রাখা বেশ কঠিন। কিন্তু যদি একটা কৃত্রিম ভ্যাকুয়াম চেম্বারে[2] উক্ত অবজেক্ট তৈরী করা হয় তাহলে অবজেক্টটিকে বায়ুর  $14.70\text{kg}/\text{inch}^2$  পেশার সহ্য করতে হবে না।

সী লেভেলের যত উপরে উঠা হয় ততাই বায়ু চাপ কমতে থাকে।[3]

অবজেক্টটিকে তার সারভাইভাল এনভায়রনমেন্টে(হাই অ্যাটিটিউড) ছেড়ে দিলে তা বিনা জ্বালানি খরচ করে চির দিন(ড্যামেজ না হওয়া পর্যন্ত) ভাসতে থাকবে। যেভাবে সমুদ্রে কোন ভাসমাস বস্তু ভাসে।

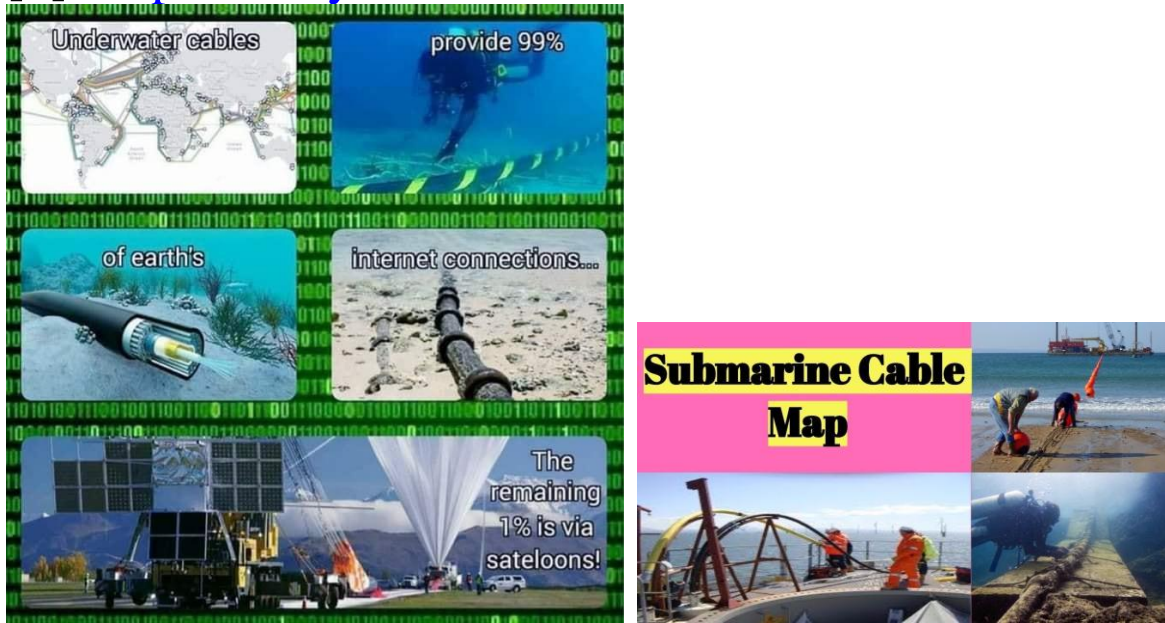
কথিত স্যাটেলাইটকেও একই পন্থায় অসীম সময় পর্যন্ত ভাসিয়ে রাখা সম্ভব। যদিও কমিউনিকেশনে প্রকৃত পক্ষে স্যাটেলাইটের কোন ইউজই নেই।[4] এসব কথিত স্যাটেলাইট আই ওয়াস মাত্র যাতে মানুষকে দিয়ে কাল্পনিক গ্লোব সাপোর্ট করানো যায়।

বর্তমানে শোনা যায়, স্টারলিংক স্যাটেলাইটসহ আরো কিছু স্যাটেলাইটের মত স্ট্রীকচারকে মানুষ ক্যামেরায় ধারণ করেছে বা এর অস্তিত্ব সত্য বলে দাবি করেছে। যদি মানুষকে হেলিওসেন্ট্রিক এস্ট্রোনমি ধরে রেখে কোটি টাকা ব্ল্যাক বাজেটে চালানোর জন্য স্যাটেলাইট খাত করে সত্যিই এমন কিছুকে উড়ায়, তবে আসমানি

ছাদের নিচে উহা উপরিউক্ত পন্থায় ভাসাবো এতে হেলিওসেন্ট্রিক গ্লোব তত্ত্বের বায়ুমন্ডলের স্তর এবং জিরো গ্রাভিটিকে সত্যায়নের প্রয়োজন নেই।

Ref:

- [1]. <https://bit.ly/3bVsogg3>
- [2]. <https://bit.ly/2WZ5lwh>
- [3]. <https://bit.ly/2TA9tkd>
- [4]. <https://bit.ly/2LSlBZs>
- [5]. <https://bit.ly/2ZuFRZc>



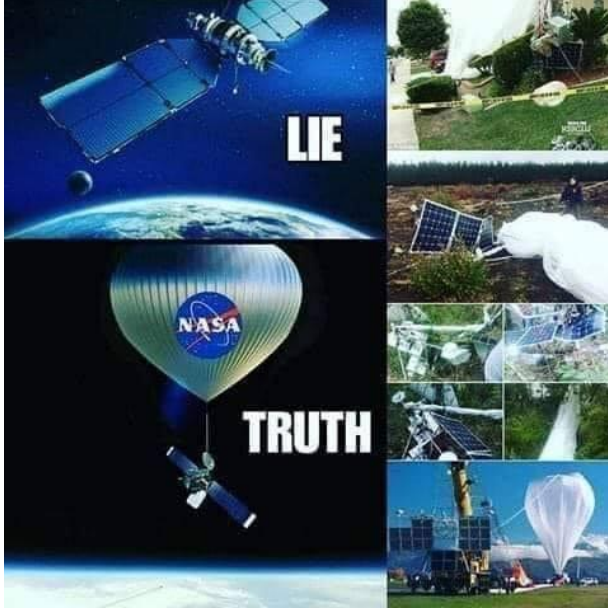
R:M: উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা আপনারা স্যাটেলাইটের মূল ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন, আশা করি। এবার আমি আরেকটু সহজ করে কিছু বিষয় আপনাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ। সাথে আরো কিছু তথ্য থাকবে। তবে এখানে প্যারানরমাল কিছু আলোচনা থাকবে। তাই এটুকু বিজ্ঞান প্রেমীদের না পড়লেও চলবে। কারণ বিজ্ঞান দিয়ে ফেরেস্তা ও জিনদের অস্তিত্ব পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।



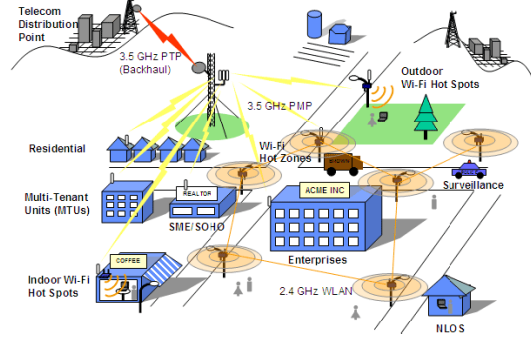
স্যাটেলাইট বলতে আমরা যে জিনিসকে বুঝে আসছি, অর্থাৎ পৃথিবীর কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান একটি মহাকাশ স্টেশন (আই এস এস / ষ্টার লিংক ইত্যাদি)। যা কিনা সবসময় পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এবং তথ্য সরবরাহ করে আবার পৃথিবীতে প্রেরণ করে। যদি আমরা ধরে নেই এমনটা হয়, তবুও বিষয়টা অযৌক্তিক। কারণ তীব্র গতিসম্পন্ন ও চলমান (ঘূর্ণায়মান) পৃথিবীর মজবুত বায়ুমণ্ডলের স্তর (চলমান গাড়ির ছাদ) ভেদ করে স্যাটেলাইট বা রকেট যদি কক্ষপথে যেতে চায় তাহলে সেগুলো ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা। আরো একটা প্রশ্ন চলে আসে। ওগুলো যাওয়ার জন্য আকাশের (বিজ্ঞানের ভাষায় বায়ুমণ্ডলের মজবুত স্তর) দরজা খুলে দেয় কে ?



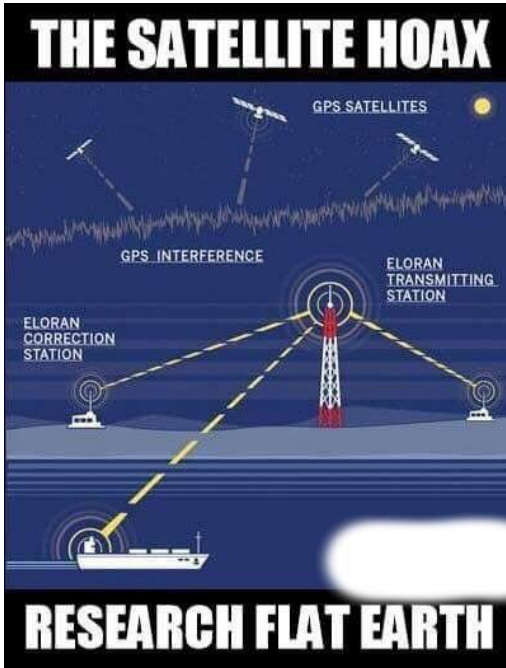
এবার আসি ৫ জুন ২০২০ থেকে ১০ জুন ২০২০ ষ্টার লিংক দেখা যাওয়ার প্রসঙ্গে। সেগুলো তো ইউ এফ ও বা বিমানও হতে পারে। আর ইউ এফ ও হচ্ছে জিনদের বাহন। এবং জিনেরা ইউ এফ ওর জন্য সরাসরি সূর্য থেকে এনার্জি নিতে পারে। আমাদের কাছ থেকে টাকা নেয়ার জন্য এবং কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান স্যাটেলাইটে এর অস্তিত্ব প্রমানের জন্য এইসব নাটক করা নাসার জন্য কোনো ব্যাপারই না। আর নাসা এবং জিনেরা একসাথেই কাজ করে। সুতরাং আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।



#### Quick and Low-Cost Deployment of Services



সর্বশেষে এ কথাই বলতে চাই। নাসা ভক্তরা যেমনটা মনে করে, ওরকম কোনো স্যাটেলাইট নাই। সর্বোচ্চ এতটুকু হতে পারে, কোনো হিলিয়াম বেলুনে বা ড্রোন বিমানে কিছু হাই রেজুলেশনের ক্যামেরা লাগিয়ে রেখেছে। কারণ মাঝে মাঝে এগুলো বিভিন্ন জায়গায় পতিত হতে দেখা গেছে।



এবার তো আরেকটি প্রশ্ন চলে আসে। তাহলে নেটওয়ার্ক কাজ করে কিভাবে?

মূল স্টেশন থেকে সাবমেরিন কেবল দিয়ে, টাওয়ার থেকে টাওয়ারে কাজ করে। এই টাওয়ার গুলো উপরের দিকে কিছু দূর পর্যন্ত সিগন্যাল প্রেরণ করে অন্য একটা টাওয়ার সেটা ক্যাপচার করে ব্যাস, এটাই আশা করি সব রহস্যের জাল উন্মোচন হয়েছে।

নাসা আমাদেরকে ধোঁকা দিয়ে একদিকে যেমন ব্যবসা করছে অপরদিকে ভ্রান্ত ধারণাকে প্রমোট করছে।

### **টাইপ ১,২,৩ সিভিলাইজেশনের ধোঁকা:**

অপবিজ্ঞানী ও জীন শয়তানেরা মিলে আমাদের এই সিভিলাইজেশনকে ৩ ভাগে ভাগ করেছে।

ক) টাইপ ১ সিভিলাইজেশন

খ) টাইপ ২ সিভিলাইজেশন

গ) টাইপ ৩ সিভিলাইজেশন



ক) টাইপ ১ সিভিলাইজেশন: এখানে পৃথিবীর সকল সম্পদ বা এনার্জিকে কাজে লাগানো হবে। অর্থাৎ বর্তমানে আমরা টাইপ ১ সিভিলাইজেশন আছি। এবং পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের চেষ্টা করা হচ্ছে। পৃথিবীর এনার্জি শেষ হয়ে গেলে পৃথিবীবাসীকে টাইপ ২ সিভিলাইজেশন তুকার চেষ্টা করতে হবে।

খ) টাইপ ২ সিভিলাইজেশন: এখানে চাদ, সূর্য ও নক্ষত্র থেকে এনার্জি বা শক্তি গ্রহণ করা হয়। যা রীতিমতো জিনেরা করে আসছে। অপবিজ্ঞানীরা চাচ্ছে জিনদের কাছ থেকে সেই টেকনোলজি শিখে নিতে। এবং তা মানুষের জন্য ব্যবহার করতে।

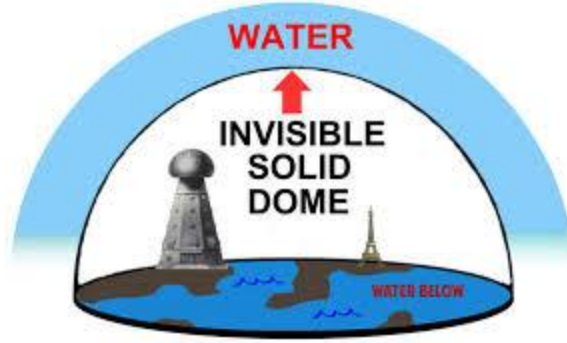
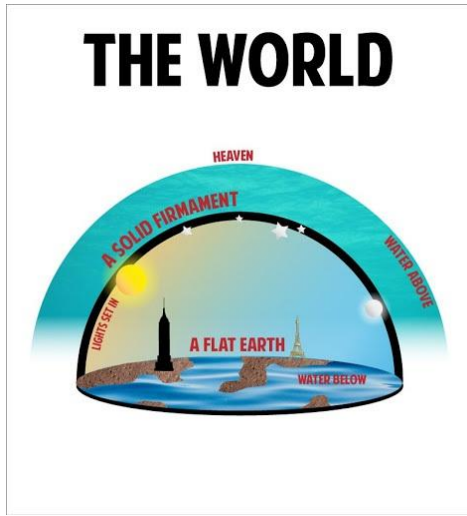
গ) টাইপ ৩ সিভিলাইজেশন: এখানে পুরো গ্যালাক্সি (ওদের ধারণা অনুযায়ী) থেকে এনার্জি টেনে নেয়া হবে। এবং তা দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জীবন ধারণ করবে। এটাই দাজ্জাল ও তার দোসর অপবিজ্ঞানীদের কল্পনা। তারা আমাদেরকে এসবের (দাজ্জালের কৃতিম জ্ঞান ও অমরত্ব) স্বপ্ন দেখায়ে আর এই জিনিসগুলোর পিছনে যেসব অপবিজ্ঞানী কাজ করে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে বর্তমানে মিচিও কাকু একজন অন্যতম সেরা ব্যক্তি।

কাফেররা যত যাই করুক, মুমিনদেরকে ধোঁকায় ফেলতে পারবে না। মুমিনরা ঠিকই দাজ্জালের কপালে কাফ ফা রা লিখাটা (চলমান অপকর্ম) পড়ে ফেলতে পারবে, ইনশাআল্লাহ। মডারেটরাই (অপবিজ্ঞান প্রেমী) ধোঁকা খাবে সবচেয়ে বেশি। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের অন্তর চক্ষুকে উন্মুক্ত করে দিন। যেন দাজ্জালের সমস্ত ষড়যন্ত্র গুলো বুঝতে পারি।

## **মানুষ কী আসমানের প্রান্তসীমা অতিক্রম করতে পারবে? পবিত্র কুরআন কী বলে?**

সূরা আর রাহমানের ৩৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ইদানীং অনেকেই বলছেন যে, এখানে বুঝানো হয়েছে মানুষ যন্ত্র ব্যবহার করে আসমানের প্রান্তসীমা

অতিক্রম করতে পারবে এবং মানুষ চাঁদে গিয়ে তা প্রমাণও করেছে। কিন্তু তাদের ব্যাখ্যা মুফাসসিরিনে কেরামের ব্যাখ্যার সাথে মিলে না বলেই আমার মনে হয়েছে। মুফাসসিরিনে কেরাম কী বলেছেন তা আমরা একটু পরেই দেখব। আগে দেখা যাক চাঁদে বা মঙ্গলে যদি মানুষ যায়, সেটাকে আসমানের প্রান্তসীমা অতিক্রম করা বলা যেতে পারে কিনা?



চাঁদে, মঙ্গল গ্রহে বা এ রকম অন্য কোনো গ্রহে মানুষের যাওয়াটাকে আসমানের প্রান্তসীমা অতিক্রম করা বলা যাবে কিনা তা নির্ভর করছে আসমানের প্রান্তসীমা কোথায় তা জানার উপর। যতক্ষণ আসমানের প্রান্তসীমাটা কোথায় তা নির্ণয় করা না হবে, ততক্ষণ চাঁদে যাওয়া বা তার চেয়েও দূরে যাওয়াটাকে আসমানের প্রান্তসীমা অতিক্রম করা বলা যাবে না।

তাহলে আমাদেরকে আগে দেখতে হবে আসমানের প্রান্তসীমাটা কোথায়? তারও আগে জানতে হবে যে, আসমান কী? সেই বিষয়ে একটু পরেই আসছি। আগে আয়াতটি দেখা যাক। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَاللَّارِ مَاوَاتِ السَّارَاقُطِ مَنْ تَنْفُذُوا أَنْ اسْتَطَعْتُمْ إِنْ وَالْإِنْسِ الْجِنَّ مَعْشَرَ يَا  
بِسُلْطَانٍ إِلَّا تَنْفُذُونَ لَا فَانْفُذُوا ض

অর্থ: "হে জিন ও মানবকূল, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের প্রান্তসীমা অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাথে কুলায়, তবে অতিক্রম করা কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না"। সূরা আর রাহমান, ৩৩।

এখানে আসমান ও জমিনের প্রান্তসীমা অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে সম্ভব বলে বুঝাতে আল্লাহ তা'লা এই আয়াত নাজিল করেননি। এই আয়াত নাজিল করা হয়েছে এটা বুঝানোর জন্য যে, মানুষ (আল্লাহর বিচার থেকে পালিয়ে বাঁচতে) আসমান জমিনের প্রান্তসীমা অতিক্রম করে পালিয়ে যেতে পারবে না। তবে আল্লাহর আদেশ হলে বা আল্লাহর দেয়া ছাড়পত্র নিয়ে তা পারা যাবে।



এই যে আল্লাহর দেয়া আদেশ বা অনুমতিপত্র অথবা শক্তি পেলে পারা যাবে বলেছেন, এটাকে আমরা বিশেষ কোনো নবী রাসুলের জন্য বলেই মনে করতে পারি। যেমন রাসুল স. আসমানের প্রান্তসীমা অতিক্রম করেছেন আল্লাহর দেয়া শক্তি এবং অনুমতিক্রমে। তিনি মেরাজে গিয়েছেন আসমানের সীমা অতিক্রম



করো। এটা আল্লাহর অনুমতি নিয়ে আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে। আর ঈসা আ. কেও আল্লাহ আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন।

## আসমান কী জিনিস?

আসমান শব্দটি আরবি سماء 'সামাউন' থেকে এসেছে। অর্থ – উপরে, জমিনের বিপরীত, উপরের খালি

জায়গা। কোরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি যে, আসমানের দুটি অর্থ আছে। একটি অর্থ হচ্ছে আমাদের মাথার উপরের খোলা স্থান। একই অর্থে উপরের সব কিছুকেই আসমান বলা হয়। এই অর্থের পক্ষে দলীল

কোরআনের আয়াত- رَزَقًا مَّرَاتِلًا مِّنْ بِهِ أَخْرَجَ مَاءَ السَّمَاءِ مِنْ وَأَنْزَلَ لَكُمْ

"আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবো" সূরা বাকারা ২২ অন্য আয়াতে طَهُورًا مَاءَ السَّمَاءِ مِنْ وَأَنْزَلْنَا

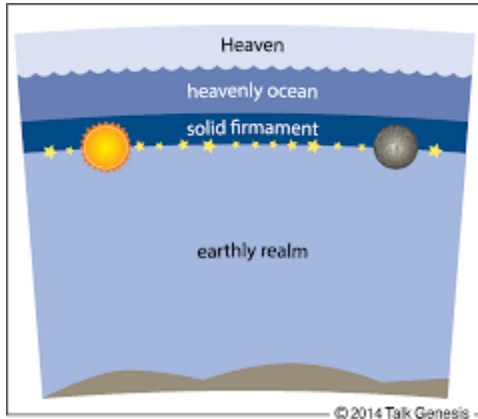
অর্থ: এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্যে পানি বর্ষণ করি। সূরা ফুরকান, ৪৮। অন্য আয়াতে

مَوْتِهَا بَعْدَ الرُّضِّ بِهِ فَأَحْيَا مَاءً مِنَ السَّمَاءِ مِنَ اللَّهُ أَنْزَلَ وَمَا

অর্থ: আর আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, তদ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন। সূরা বাকারা, ১৬৪।

অন্য আয়াতে এসেছে- نَبَاتَ بِهِ أَفْخَرَجْنَا مَاءَ السَّمَاءِ مِنْ أَنْزَلِ الَّذِي وَهُوَ شَيْءٌ كُلٌّ

“তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি” সূরা আনআম, ৯৯।



এ রকম আরো অনেক আয়াত আছে যেগুলোতে বলা হয়েছে আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। আমরা জানি যে, মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। আর মেঘ থাকে আমাদের মাথার কিছুটা উপরের দিকে, খোলা আকাশে এই খোলা আকাশকে আসমান বলা হয়েছে উক্ত আয়াতগুলোতে।

আবার কোরআনের অন্য কয়েকটি আয়াত থেকে আসমানের দ্বিতীয় একটি অর্থ বুঝা যায়। সেটা হল আসমান একটি দরজা বিশিষ্ট বস্তু । অনেকটা ছাদের মত। স্তরে স্তরে তা বানানো হয়েছে। যাতে পাহারাদার নিযুক্ত আছে। সেটির অবস্থানও উপরের দিকে। এর পক্ষেও আয়াতে দলিল আছে। সূরা হিজর এর ১৪ ও ১৫ নং আয়াত:



"যদি আমি ওদের সামনে আকাশের কোন দরজাও খুলে দেই আর তাতে ওরা দিনভর আরোহণ ও করতে থাকে তবুও ওরা এ কথাই বলবে যে, আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে, না বরং আমরা যাদুগ্রস্থ হয়ে পড়েছি"। অন্য আয়াতে,

يَدْخُلُوْا وَلَآ السَّمٰوٰتِ اَبْوَابٌ لّٰهُمْ نُفْتَحُ لَهَا عَنْهَا وَاسْتَكْبَرُوْا بِآيٰتِنَا كَذَّبُوْا الَّذِيْنَ اِنَّ  
الْمُجْرِمِيْنَ زِيْنٰجٌ وَكَذٰلِكَ ۚ الْخِيَاطِ سَمَّ فِي الْجَمَلُ يَلْجَ حَتّٰى لِحْنَةً نَّ

অর্থ: "নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং এগুলো থেকে অহংকার করেছে, তাদের জন্যে আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। আমি এমনভাবে পাপীদেরকে শাস্তি প্রদান করি"। সূরা আরাফ, ৪০। আরেকটি আয়াত,

طَبَاقًا سَمَآوَاتٍ سَبْعَ خَلَقَ الَّذِي

"তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন"। সূরা মুলক, আয়াত : ৩। এ আয়াতগুলোতে বুঝা যাচ্ছে, আসমান একটি ছাদের মত বস্তু যাতে দরজা আছে এবং দরজায় পাহারাদার নিযুক্ত আছে। তাহলে আমরা আসমান শব্দের দুটি অর্থ পেলাম। একটি হচ্ছে খোলা আকাশ। অন্যটি হচ্ছে দরজা বিশিষ্ট আকাশ। যদিও বিজ্ঞানীরা (?) এই দ্বিতীয় অর্থের আসমানটাকে স্বীকার করেন না।

কারণ, তাদের দৃষ্টি সীমায় এখনো সেই আসমান ধরা দেয়নি। বিজ্ঞানীদের(?) মধ্যে অনেকেই আবার কিছু না দেখে বা যন্ত্রপাতির মাধ্যমে হলেও কিছুর অস্তিত্ব বুঝতে না পারলে তা আছে বলে মনে করেন না। তাই তাদের মতে আসমান হচ্ছে খোলা আকাশ। আর দ্বিতীয় অর্থে দরজাবিশিষ্ট আসমান বলতে তাদের কাছে কিছুই নাই। তবে ইদানীং অনেক বিজ্ঞানী বলছেন যে এই মহাবিশ্বে মানুষের দেখা বা জানাশোনা বস্তুর চেয়ে অদেখা বা অজানা বস্তু অনেক অনেক বেশি।



তাহলে দরজা বিশিষ্ট আসমানের অস্তিত্ব নাই তা বলা যাবে না। অনেকের মতে সেই দরজা বিশিষ্ট আসমান আছে মহাবিশ্বের প্রান্তসীমায়, যা মহাবিশ্বকে ঘিরে রেখেছে। এগুলো একটার চেয়ে আরেকটা অনেক অনেক বড়। আর সেই আসমানগুলোর আয়তন এখনো মানুষের কল্পনার চৌহদ্দি থেকে অনেক অনেক দূরে।

মানুষ এই পর্যন্ত যা কিছু নিয়ে গবেষণা করছে তা দরজা বিশিষ্ট আসমানের ভেতরেই। দরজা বিশিষ্ট আসমানের ভেতরের মহাকাশের সীমানা এখনো মানুষ জানতে পারেনি। তাই সেই দরজা বিশিষ্ট আসমানের অস্তিত্ব সম্পর্কেও এখনো

মানুষের কোনো ধারণা নাই। বিজ্ঞানীদের মতে দরজা বিশিষ্ট আসমান বলতে কিছু নাই। আবার অনেকে আসমানের প্রথম অর্থ খোলা স্থানকেই শুধু আসমান বলছেন। আর এ-খোলা স্থানকেই বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে সাতটি আসমান বলে মনে করছেন। এই অর্থটি অনেক মুফাসসিরিনে কেরামও করেছেন।

তাহলে সুরা আর রাহমানের ৩৩ নং আয়াতে যেই আসমানের কথা বলা হয়েছে সেটা যদি আমরা খোলা আকাশ বলেই মনে করি এবং এর শুরুতেই চাঁদের আগে, আমাদের বাড়ির (পৃথিবী) উঠোনে কয়েকটি সীমা দিয়ে বলি যে এটাই আসমানের সীমানা, তাহলে বলাই যায় যে, চাঁদে গিয়ে মানুষ আসমানের প্রান্তসীমা অতিক্রম করে ফেলেছে। কিন্তু আয়াতে আল্লাহর কথা বলার ধরণ দেখেই বুঝা যাচ্ছে এখানে দ্বিতীয় অর্থে আসমান বুঝানো হয়েছে এবং আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ এর প্রান্তসীমা অতিক্রম করতে পারবে না বলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া হয়েছে।

যেমন ধরা যাক উপরে বর্ণিত সুরা আরাফের ৪০ নং আয়াতে যেখানে দরজা বিশিষ্ট আসমানের কথা বলা হয়েছে, সেখানে আরো একটি কথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহর আয়াত সমূহকে যারা মিথ্যা বলেছে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না সুচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। এখানে কেউ যদি বিরাট এক সুচ বানিয়ে তার ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করিয়ে দেয়, তাহলে বলা যাবে না যে, তারা এবার জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। এখানে কখনো পারবে না বুঝানো হয়েছে।

ঠিক একইভাবে সুরা আর রহমানের ৩৩ আয়াতেও বুঝানো হয়েছে যে, মানুষ ও জ্বীন কখনো আসমান ও জমিনের প্রান্তসীমা অতিক্রম করতে পারবে না এবং আল্লাহর ধরা থেকেও পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। এখন কেউ যদি বাড়ির উঠোনকে (মহাবিশ্বের তুলনায় চাঁদ ও মঙ্গল বাড়ির উঠোনের মত) আসমানের প্রান্তসীমা বানিয়ে, চাঁদে গিয়ে (?) সেটাকে আসমানের প্রান্তসীমা অতিক্রম করেছে বলে দাবি করে, তাহলে ত বড় একটি সুচ বানিয়ে তার ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করিয়ে দেয়ার মত হয়ে গেলা। তাই সুরা আর রহমানের ৩৩ নং আয়াতে দরজা বিশিষ্ট আসমানের কথা বলা হয়েছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। যা মানুষ ও জ্বীন কখনো অতিক্রম করতে পারবে না।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে তাদের জন্য আসমানের দরজাও খোলা হবে না এবং তাদেরকে জানাতেও প্রবেশ করানো হবে না। এতে বুঝা যাচ্ছে জান্নাত

আসমানের উপরেই হবে, (তাফসীরে কুরতুবী)। যেখানে মুমিনদেরকে আসমানের দরজা খুলে প্রবেশ করানো হবে। এ থেকে আরও স্পষ্টভাবেই বুঝা গেল যে প্রথম অর্থে অর্থাৎ খোলা আকাশ অর্থে এই আয়াতে আসমান বুঝানো হয়নি। বরং দরজা ও পাহারাদার বিশিষ্ট আসমানের কথা বুঝানো হয়েছে। যা অতিক্রম করা মানুষ ও জ্বীনের পক্ষে (অনুমতি ছাড়া) সম্ভব নয়।

কিন্তু অন্য একটি আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে দরজা বিশিষ্ট হলেই আসমানের দ্বিতীয় অর্থ করার কোনো প্রয়োজন নাই। বরং প্রথম অর্থে আসমানের মধ্যেও অর্থাৎ খোলা আকাশেও দরজা থাকতে পারে। আয়াতটি হল

مُنْهَمِرٍ بِمَاءِ السَّمَاءِ أَبْوَابَ فَفَتَحْنَا

অর্থ: তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে। সুরা কামার, ১১। এখানে দরজা খুলে দিয়ে বৃষ্টি বর্ষণ করার কথা বলা হয়েছে। আমরা জানি মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়, আর মেঘ থাকে আমাদের মাথার সামান্য উপরে খোলা আকাশে। তাহলে দরজা বিশিষ্ট হলেই ছাদের মত হতে হবে তা জরুরী নয়। এবার অন্য একটি আয়াতের দিকে নজর দেয়া যাক। এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে খোলা স্থানকে আসমান বলা হলেও আসমানের অন্য একটি অর্থ আছে যা আমি উপরে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি। আয়াতটি হল

بَأْمُرِهِ الْبَحْرُ فِي يَتَجَرَّ وَالْفُلُكُ الْأَرْضُ فِي مَّا لَكُمْ سَخَّرَ اللَّهُ أَنْ تَرَ أَلَمْ  
لِرَعُوفٍ بِالنَّاسِ لَهُ أَلَّا نَّإِذْنِهِ إِلَّا الْأَرْضُ عَلَى تَقَعُ أَنْ السَّمَاءَ وَيُمْسِكُ  
رَحِيمٌ

অর্থ: তুমি কি দেখ না যে, ভূপৃষ্ঠে যা আছে এবং সমুদ্রে চলমান নৌকা তৎসমুদয়কে আল্লাহ নিজ আদেশে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তিনি আকাশ স্থির রাখেন, যাতে তাঁর আদেশ ব্যতীত ভূপৃষ্ঠে পতিত না হয়। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি করুণাশীল, দয়াবান। সুরা হজ্জ ৬৫। এই আয়াতে বলা হয়েছে আসমানকে আল্লাহ এমনভাবে স্থির রাখেন তা যেন জমিনের উপর পতিত না হয়। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, যে খোলা স্থান অর্থাৎ মহাশূন্যকে আমরা এতক্ষণ যে আসমান বলে আসছিলাম তাছাড়াও এমন একটি আসমান আছে যা আল্লাহ স্থির না রাখলে জমিনের উপর পড়ে যেত। সেটা অবশ্যই খোলা স্থান বা মহাশূন্য নয়। আর খোলা আকাশকে আসমান ধরে নিলেও সেটাকে মহাশূন্য বলা হয়ে থাকে। সেই মহাশূন্য জমিনের উপর পড়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে বলে মনে হয় না। শূন্য মানে কিছু নাই। খোলা আকাশ। সেটা এক অর্থে আসমান। আবার জমিনের উপর যেটার পড়ে যাওয়ার আশঙ্কার কথা

বলা হয়েছে সেটা নিশ্চয় দ্বিতীয় অর্থের আসমান। আর আসমান জমিনের উপর পড়ে যেত বলে অবশ্যই গ্রহ-নক্ষত্রগুলোকেও বুঝানো হয়নি। কারণ গ্রহ-নক্ষত্রগুলো আসমান নয় বরং তারা আসমানে অবস্থানকারী। যে তারাগুলোকে দিয়ে আল্লাহ আসমানকে

সাজিয়েছেন। الْكَوَاكِبِ بِزِينَةِ الدُّنْيَا السَّمَاءِ زِينًا إِنَّا অর্থ: নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজির দ্বারা সুশোভিত করেছি। সূরা আস

সাফফাত, ৬।

আরো একটি আয়াত দেখা যাক-

مُنِيرًا وَقَمَرًا أَسْرَاجَ فِيهَا وَجَعَلَ بُرُوجًا السَّمَاءِ فِي جَعَلَ الَّذِي تَبَارَكَ

কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমন্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্য ও দীপ্তিময় চন্দ্র। সূরা আল ফুরকান ৬১। অন্য আয়াতে وَلَقَدْ لِلنَّاطِرِينَ وَزَيْنَاهَا بُرُوجًا السَّمَاءِ فِي جَعَلْنَا অর্থ: নিশ্চয় আমি আকাশে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি এবং তাকে দর্শকদের জন্যে সুশোভিত করে দিয়েছি। সূরা হিজর ১৬।

বুরুজ বলা হয় তারকাগুচ্ছকে। গ্রহ, নক্ষত্র, চাঁদ, সূর্য ইত্যাদি সবই আসমানে অবস্থিত। আবার সেই আসমান খোলা স্থান। তাহলে এখানে আসমান অর্থ খোলা স্থান মনে করতে পারি। আবার যে আসমান পড়ে যাওয়ার আশঙ্কার কথা বলা হয়েছে সেটাকে দ্বিতীয় অর্থে আসমান ধরে নিতে পারি। এবং প্রথম অর্থে আসমানে দরজা থাকলেও যে আসমানের সীমানা অতিক্রম করা যাবে না বলা হয়েছে সেটা দ্বিতীয় অর্থে আসমান ধরে নিতে পারি।

এখানে বলে রাখা ভাল যে, আসমান সম্পর্কিত আয়াতগুলোকে অনেক মুফাসসেরিনে কেলাম আয়াতে মুতাশাবিহাত **مَا تَشَابِهَاتُ آيَاتِ** বলেছেন। অর্থাৎ এগুলোর মর্মার্থ আমরা বুঝতে না পারলেও এটা বিশ্বাস করি যে আল্লাহ যা বলেছেন সেটাই সত্য, আমরা তার উপর ঈমান এনেছি। কিন্তু আয়াতে মুতাশাবিহাত বলে আমরা মেনে নিলেও যারা কোরানের আয়াতের উপর আপত্তি তুলতে সচেষ্ট, তারা ত মানবে না।

তারা বলবে যে আল্লাহ বলেছেন, মানুষ কখনো আসমানের প্রান্তসীমা অতিক্রম করতে পারবে না। কিন্তু চাঁদে গিয়ে(?) মানুষ তা করে দেখিয়েছে। তাদের জন্য বলছি যে, সুরা আর রহমানের ৩৩ নং আয়াতের দিকে আবার লক্ষ্য করুন এবং আসমান সম্পর্কিত আয়াতগুলোও লক্ষ্য করুন। বলা হয়েছে মানুষ ও জ্বীন আসমানের ও জমিনের প্রান্তসীমা অতিক্রম করতে পারবে না। এবার আসমান সম্পর্কিত আয়াতগুলোর দিকে আমরা দেখলে এবং মাথার উপরের খোলা আকাশকে আসমান মেনে নিলেও যা বুঝা যাচ্ছে তা হল চাঁদ, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি সব কিছুই আসমানের ভিতরে।



এইসব তারাগুলোতে মানুষ ঘোরাঘুরি করলেও কেও দাবি করতে পারবে না যে, সে আসমানের প্রান্তসীমা অতিক্রম করেছে। যেমন কোনো দেয়াল অতিক্রম

করার অর্থ হল দেয়াল টপকিয়ে বা যে কোনোভাবেই হোক তার অপর প্রান্তে চলে যাওয়া। তার ভিতরে থাকাকে অতিক্রম বলা হয় না। বাড়িটা অতিক্রম করার মানে কিন্তু বাড়ির ভিতরে বসে থাকা নয়। তাহলে বুঝাই গেল যে, চাঁদে(?), মঙ্গলে(?) বা অন্য কোথাও যাওয়া মানে সেটা আসমানের প্রান্তসীমা অতিক্রম করা নয়।

সূরা আর আর রাহমানের ৩৩ নং আয়াতটির ব্যাখ্যায় তাফসিরে তাবারিতে লেখা হয়েছে, **والأرض، السموات طرفاً تَجُوزُوا أَنْ تَطْعَمَ تَمَّ إِنَّ** **ذلك، ف جُوزُوا عَلَيْهِمْ؛ يَ قَدْ لَا حَتَّى رَبِّكُمْ ف تَعْجُزُوا** **أرث: যদি আসমান ও** **جَمِينِ السَّيْمَانَا اতিক্রম করে আল্লাহকে তোমাদের বিচারে অক্ষম করে দিতে** **পার, তাহলে অতিক্রম করে দেখাও। কিন্তু তোমরা তা পারবে না আল্লাহর** **অনুমতি ব্যতীত।**

### **আকাশ জয় কি সম্ভব? প্রসংগ সূরা আর রাহমানের ৩৩ নং আয়াত ডাঃ মরিস বুকাইলির ব্যাখ্যাতে বিশেষ পর্যালোচনা:**

বিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণে কোরানের কিছু কিছু আয়াতের অর্থ বুঝতে সহজ হচ্ছে তাতে কোনোও সন্দেহ নাই। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত যেসব বিষয় সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তার সবই কোরানের সাথে সামঞ্জস্যশীল। আর যে সব থিউরি



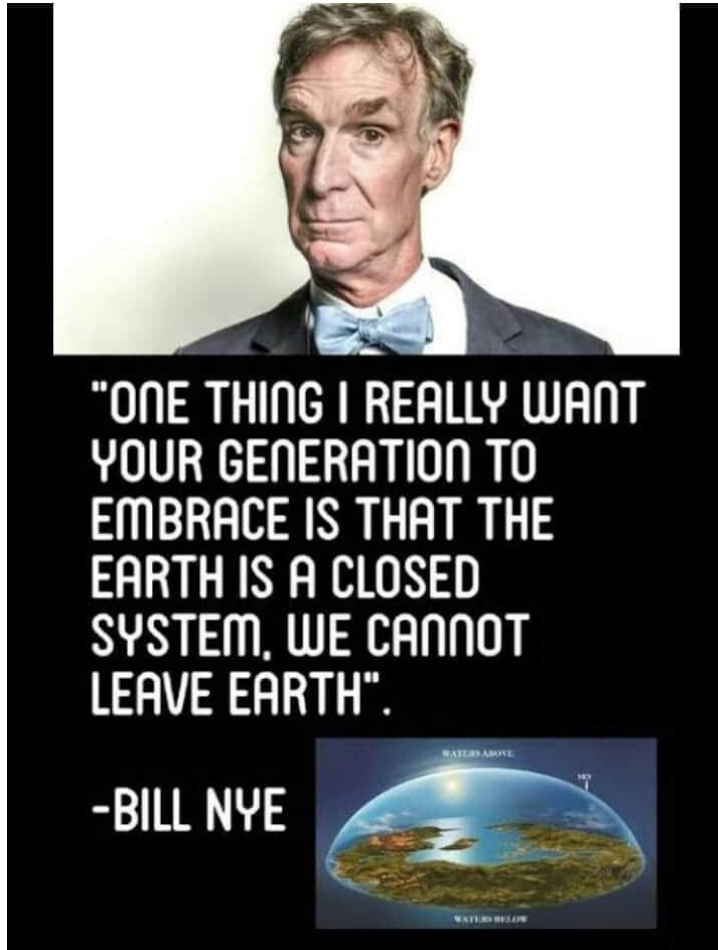
কিছু দিন পরপর মত পালটায় তার সাথে কোরানের মিল থাকুক বা না থাকুক তাতে কিছু আসে যায় না। অমিল দেখা দিলে আমরা ধরে নেব সেই বিষয়ে বিজ্ঞান এখনো অসম্পূর্ণ। তা যখনই সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে সেটাও কোরানের সাথে হুবহু মিলে গেছে। কোরান বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়। আবার কোরানের কোনো একটি বিষয়ও অবৈজ্ঞানিক বলা যাবে না। কোরানের যেসব আয়াতে আসমান জমিন এবং মখলুকাতের সৃষ্টি সম্পর্কিত কথা বার্তা আছে তা এসেছে আল্লাহ তালার অসীম কুদরত সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি মানুষের বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য। তবে কিছু কিছু আয়াত এমন আছে যেগুলো বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে বুঝতে সহজ হচ্ছে। তাহলে যখন বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছিল না তখনকার যুগের মুফাচ্ছেরিনে কেবলমাত্র কোরান বুঝেন নি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় যে তারা কোরান বুঝেছেন। এখানে লক্ষ্য করার একটি বিষয় আছে। তাহলো কোরানের অনেক গুলি মোজেজার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে কোরান অবতীর্ণ হয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত সর্ব যুগের মানুষের জীবন ব্যবস্থা হিসেবে। একারণে মানুষের জ্ঞানের পরিধি অনুযায়ী সব যুগের মানুষ কোরান বুঝতে পারে সঠিক ভাবেই এবং কোরান সর্ব যুগের জন্য উপযুক্ত একটা গ্রন্থ। যেমন একটি শব্দের একাধিক অর্থের মধ্যে মানুষের জ্ঞান অনুযায়ী একটি অর্থ ধরে নিয়ে আল্লাহ তালার কি বলতে চেয়েছেন সেটা বুঝে নেয়া যায়। পরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে আগের অর্থটি না করে শব্দের অন্য অর্থটি করলে তখনও দেখা যায় কোরানের আসল বা মূল বিষয়টি অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। তখন আগের অর্থটি আর প্রযোজ্য নাহলেও আগের যুগে কোরানের ভুল অর্থ করা হয়েছিল তা বলা যাবে না। বলতে হবে সেই যুগের জন্য সেই অর্থটাই প্রযোজ্য ছিল বা যথেষ্ট ছিল। একটি বিষয়ে ওলামায়ে কেবলমাত্র একমত যে যেসব আয়াতের অর্থ সুস্পষ্ট আছে, বিজ্ঞানের সাহায্যে তার বিপরীত অর্থ করা জায়েজ নাই।

বিজ্ঞান যদি এরকম সুস্পষ্ট আয়াতের বিপরীতে কিছু বলে তাহলে ধরে নিতে হবে এই বিষয়ে বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ। বাস্তবেও দেখা গেছে অনেক বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মতভেদ প্রকটা। কোনোও একটা বিষয়ে একটি মতামত কিছু দিন টিকে থাকার পরে পরবর্তী আরো উন্নত গবেষণার ফলে আগের ধারণাটি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। বর্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে যেসব নতুন বিষয় আবিষ্কৃত হচ্ছে তার সাথে কোরানের মিল গুলো দেখিয়ে দিতে যে সব বিজ্ঞানী সহযোগিতা করছেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ফ্রান্সের প্রখ্যাত সার্জন বিজ্ঞানী ডাঃ মরিস বুকাইলি।

তিনি আগের মুফাচ্ছেরিনে কেরামের ব্যাখ্যা থেকে সামান্য সরে গিয়েও মূল বিষয়টি ঠিক রেখে কিছু কিছু আয়াতের বিজ্ঞান সম্মত তাফসীর করেছেন, যা সত্যই প্রশংসনীয়। তবে আমার দেখাতে তিনি দুয়েকটি জায়গায় মূল বিষয় থেকে সরে গিয়েছেন।

যার কারণে আয়াতের অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে গেছে। একটি হচ্ছে সুরা আর রাহমানের ৩৩ নং আয়াত। আরেকটি হচ্ছে সুরা হিজর এর ১৪ আর ১৫ নং আয়াত। সুরা আর রাহমানের ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ তালা জিন ও মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলেছেন, أَفْطَارٍ مِنْ تَنْفُذُوا أَنْ اسْتَطَعْتُمْ إِنَّ وَالْإِنْسَ الْجِنَّ مَعْشَرَ يَا ۖ (হে জিন ও মানবকূল, নভোমন্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রাপ্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাথে কুলায়, তবে অতিক্রম করা কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না। সুরা আর রাহমান = ৩৩ এই আয়াতে আল্লাহ তালা জিন আর মানব জাতির সামনে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন যে তোমরা আমার অনুমতি ব্যতীত আসমান জমিনের প্রাপ্ত সীমা অতিক্রম করতে পারবে না। অর্থাৎ কেও চাইলেও আল্লাহ তালার ধরা থেকে বাঁচতে পারবে না। আর ডাঃ বুকাইলি সাহেব দেখাতে চেয়েছেন যে এই আয়াতে আকাশ অতিক্রম করা সম্ভব হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত আছে এবং বিজ্ঞানীরা বর্তমানে আকাশ জয় করে আল্লাহর বানীকেই সত্য প্রমাণ করেছেন।

অথচ এই কথাটি আয়াতের মূল বিষয়ের বিপরীত। আয়াতের আসল অর্থ কি এবং আসমান ও জমিনের সীমানা মানুষ অতিক্রম করেছে কিনা তা বুঝার জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জেনে নিতে হবে। তা একটু পরেই আলোচনা করা যাবে ইনশাআল্লাহ।



তার আগে ডাঃ বুকাইলি সাহেবের তারজুমা আর ব্যাখ্যাটা একটু দেখা যাক। এটা আমি উদ্ধৃত করছি তার লিখিত “দি বাইবেল, দি কুরআন এন্ড দি সাইন্স” বইয়ের বাংলা অনুবাদ “বাইবেল কোরান ও বিজ্ঞান” বই এর ১৬৬ নং পৃষ্ঠা থেকে।

مَعَشَرَ يَا  
اسْتَطَعْتُمْ إِنِّ وَالْإِنْسِ الْجِنَّ  
(۳۳) إِنِّ نَ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا ۚ لَّا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطِ  
হে জ্বিন ও মানবজাতি! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে

পারো তবে অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা তা পারবে না শক্তি ব্যতিরেকে।(সূরা আর রাহ মান-৩৩) এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন “এ তরজমার কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রয়োজনা প্রথমত 'যদি' শব্দটি দ্বারা প্রস্তাবনার সফলতা কোন সম্ভব বা অসম্ভব অবস্থার নির্ভর করে তা বুঝায়া কিন্তু আরবী ভাষায় ঐ অবস্থার ক্ষেত্রে এমন একটি ব্যঞ্জনা আনা সম্ভব যা অনেক বেশি সুস্পষ্ট। সম্ভাব্যতা প্রকাশের জন্য ‘ইয়া’ সম্পাদনযোগ্য কাজের জন্য ‘ইন’ এবং সম্পাদনের অযোগ্য কাজের জন্য ‘লাও’ শব্দ প্রয়োগ করা হয়। আলোচ্য আয়াতে ‘ইন’ শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় কাজটি সম্পাদনযোগ্য বলে বুঝা যাচ্ছে। অর্থাৎ মানুষের পক্ষে আকাশ ও পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম প্রকৃতপক্ষে সম্ভব” এই ছিল ডাঃ বুকাইলি সাহেবের তারজুমা আর ব্যাখ্যা। এখানে তিনি আয়াতটিকে মানুষের আসমান এবং জমিনের সীমানা অতিক্রম করা সম্ভব হওয়ার পক্ষে প্রমাণ হিসেবে দেখিয়েছেন এবং মানুষের চন্দ্রে যাওয়া এবং মহাশূন্যে নভোচারীদের পৃথিবী ঘুরে আসাকে আকাশ জয় বলে দাবী করেছেন। তিনি বলেন “সুতরাং মানুষ যে একদিন মহাশূন্য জয় করবে এ আয়াতে তার সুস্পষ্ট আভাস রয়েছে”। যদিও তিনি এর পরে বলেছেন যে “মানুষের ঐ কাজের জন্য যে শক্তির سُلْطَان (সুলতান) প্রয়োজন হবে তা সর্বশক্তিমানের কাছ থেকে আসবে বলে মনে হয়”। কিন্তু আবার সূরা হিজর এর দুটি আয়াতের ব্যাখ্যাতে তিনি মানুষের আবিষ্কৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতে সেই শক্তি হিসেবে দাবী করেছেন। তার বই থেকে আবারও দেখা যাক “অপর দুটি আয়াত হচ্ছে সূরা হিজরের ১৪ ও ১৫ আয়াত। প্রসঙ্গ থেকে বুঝা যায় আল্লাহ এখানে মক্কার অবিশ্বাসীদের কথা বলেছেন-

مَا سَكَّرَتْ لَكُمْ أَعْيُنَآ إِنِآ ۙ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْزُجُونَ  
(أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ) ১৫ (যদি তাদের জন্য আকাশের এক দুয়ার খুলে দেই এবং তারা দিনের বেলা তাতে আরোহণ করে, তবুও তারা বলবে আমাদের দৃষ্টি মোহাবিষ্ট হয়েছে, নতুবা আমরা এক যাদুগ্রন্থ সম্প্রদায়া এই আয়াতের

ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ঐ কথায় এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ হয়েছে। এমন দৃশ্য মানুষ যা কল্পনাও করেনি। লক্ষ্য করা যেতে পারে। বাক্যটি 'যদি' আরবী (লাও) দিয়ে শুরু করা হয়েছে। অর্থাৎ বাক্যের প্রস্তাবনা এমন শর্তের অধীন করা হয়েছে যা পূরণ করা আয়াতের উল্লেখিত লোকদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়।



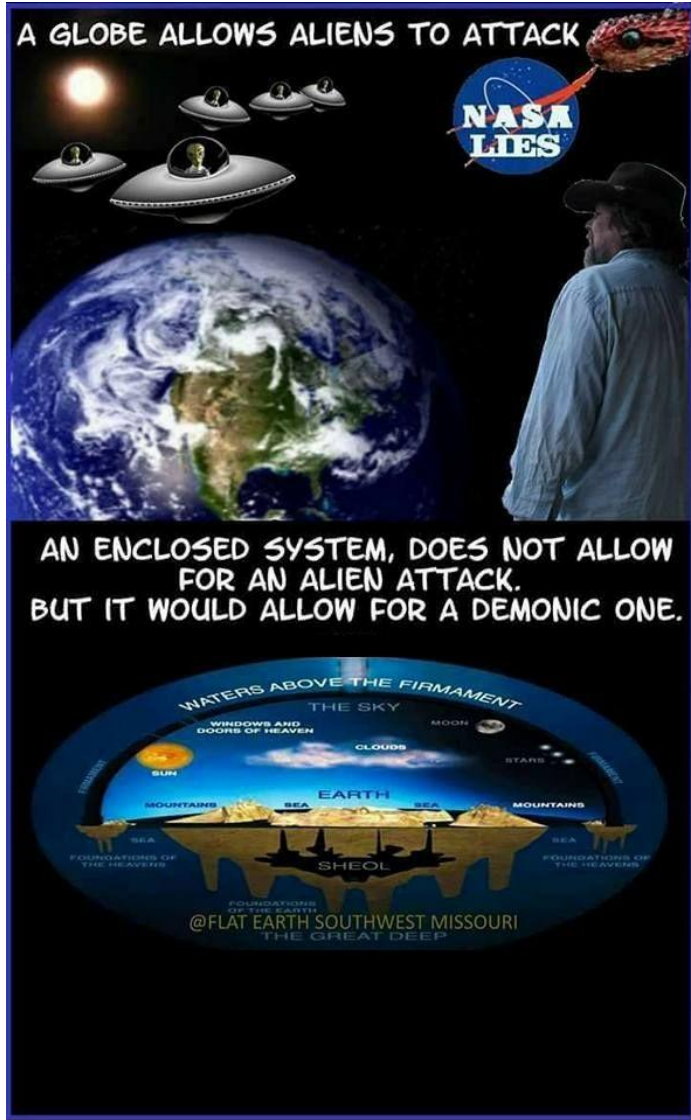
মহাশূন্য বিজয় সম্পর্কিত আয়াতে আমরা দেখেছি, আল্লাহর দেয়া বুদ্ধিমত্তা ও আবিষ্কার ক্ষমতার বলে মানুষ একদিন মহাশূন্য জয় করবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ আয়াতে এমন একটি দৃশ্যের কথা বলা হয়েছে যা সেই সময়ের মক্কার অধিবাসী লোকেরা কখনই দেখতে পাবে না। কিন্তু এ দৃশ্য অন্যদের পক্ষে দেখা সম্ভব এবং দেখার পর তাদের (নভোচারী মানুষ) মনে যে অনুভূতির সৃষ্টি হবে এ আয়াতে তার বর্ণনা আছে- তাদের দৃষ্টি বিভ্রান্ত হবে, মাতাল অবস্থায় যেমন হয়, যাদুগ্রন্থ অবস্থায় যেমন হয়। ১৯৬১ সালে প্রথমবার নভোযানে মহাশূন্যে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে আসার পর থেকে নভোচারীগণ এ যাবত ঠিক ঐ অভিজ্ঞতাই লাভ করেছেন এবং অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে তারা ঠিক ঐ কথাই বলেছেন” এবার দেখা যাক আয়াতে আসলে কি বলা হয়েছে। এই আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন কাফেরদেরকে যদি আসমানের দরজা খুলেও দেখানো হয় তবুও তারা ইমান আনবে না বরং তারা বলবে তাদের দৃষ্টি বিভ্রম হয়েছে বা তাদেরকে যাদু করা হয়েছে। আর ‘লাও’ ব্যবহার করে আল্লাহ তালা এটাও বুঝিয়েছেন যে আসলে তাদের জন্য

আসমানের দরজা খোলাও হবে না। বা তাদের জন্য আসমানের ভিতরের সেই দৃশ্য দেখা সম্ভব হবে না। যদি দেখানো হয় কথাতো যে ‘লাও’ এসেছে তা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে আসলে আসমানের দরজা খোলে তাদেরকে দেখানো হবে না। আর ডাঃ বুকাইলি সাহেব সেটাকে বলেছেন তখনকার যুগের কাফেরদের জন্য সেটা সম্ভব ছিল না ঠিকই তবে বর্তমানে তা দেখা সম্ভব এবং নভোচারীরা তা দেখে যে বিস্মিত হয়েছেন তাতে আল্লাহর কালামের সত্যতা খোজে পাওয়া যায়।



আমার কথা হল আল্লাহর কালাম সত্য সেটা ঠিক আছে তবে নভোচারীরা যা দেখেছে সেটা আয়াতে উল্লেখিত আসমানের দরজা খোলে ভিতরের অংশ দেখা নয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে তাহলে তারা যা দেখে অবাক হয়েছে সেটা কি? সেটা আসলে কি তার উত্তর বুকাইলি সাহেবের বইতেও আছে তা থেকে উদ্ধৃত করছি। একথা এখন সর্বজনবিদিত যে, পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের উপর থেকে দেখলে আকাশ আর নীল রঙ্গের দেখা যায় না। কারণ, বায়ুমন্ডলে সূর্যের আলো শুষে নেয়ার কারণে তার নীচের থেকে দেখলে আকাশের রং নীল দেখা যায়। পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের পরে উঠে মানুষ আকাশকে কালো দেখতে পায় এবং বায়ুমন্ডল সূর্যের আলো শুষে নেয়ার কারণে পৃথিবীকে নীল রঙ্গের আবৃত্ত অবস্থায় দেখতে পায়। চাঁদের কোন বায়ুমন্ডল না থাকায় ঐ অবস্থায় কালো আকাশের পটভূমিতে চাঁদকে তার নিজস্ব

রঙ্গেরই দেখা যায়। নভোচারী মানুষের চোখে এ দৃশ্য সম্পূর্ণ অভিনব, অভূতপূর্বা এই যে আকাশের অন্য রকম রঙ এবং চাঁদের অন্য রকম দৃশ্য বা গ্রহ নক্ষত্র গুলোকে কাছে থেকে দেখা বা উন্নত যন্ত্র দিয়ে দেখা এই সব কিছু আর যাই হোক আসমানের দরজা খোলে ভিতরে দেখা নয় এবং আয়াতে আসমানের যে দরজার কথা বলা হয়েছে তাও তাদের জন্য খোলা হয়নি।



তাহলে এই আয়াতে বিজ্ঞানীদের পক্ষে মহাশূন্য জয় করার ইঙ্গিত কিভাবে পাওয়া গেল? তাহলে বিজ্ঞানীদের শূন্যে ভ্রমণকে কি বলব? আকাশ বিজয় বলতে কি নিষেধ আছে? আমার কথা হল সেটাকে কেও আকাশ বিজয় বলে আত্মতৃপ্ত বোধ

করতেও পারেন তবে আয়াতে যে আসমানের কথা বলা হয়েছে সেই আসমান আর এই আকাশ এক জিনিস নয়। যা ডাঃ বুকাইলি সাহেব হয়ত এক মনে করেছেন অথবা তিনি আসমানের দুটি অর্থের মধ্যে দ্বিতীয়টাকে স্বীকার করেন না। সেটাই আমার এই নিবন্ধের মূল বিষয়। [আসমানের দুটি অর্থ একটু পরে আসছে] সুরা আর রাহমানের ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ তালা মানুষ আর জিন জাতিকে বলেছেন যে তোমরা আকাশ আর জমিনের সীমা অতিক্রম করতে পারবে না, ছাড়পত্র ব্যতীত। আর সুরা হিজর এর ১৪ আর ১৫ নং আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন কাফেরদেরকে যদি আকাশের দরজা খুলেও আল্লাহ তালা বসুন্ধর সৃষ্টি সমূহ দেখানো হয় তবুও তারা ইমান আনবে না। এখানে প্রথমত আয়াতটিতে ‘লাও’ لا ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে আসলে আকাশের দরজা খুলে কাফেরদেরকে দেখানো হবে না।

আর দেখানো হলেও তারা ইমান আনবে না। এবং আল্লাহর বিধান সমূহকে অস্বীকার করবে। তারা বলবে এগুলো বাস্তব নয়। বরং আমাদের দৃষ্টিভ্রম হয়েছে অথবা আমাদেরকে যাদু করা হয়েছে। আর ডাঃ বুকাইলি সাহেব বললেন আকাশের সেই সব বসুন্ধর সৃষ্টি সমূহ বিজ্ঞানীরা দেখে অভিভূত হয়েছেন। তার মানে আকাশের দরজাও খোলা হয়েছে এবং বিজ্ঞানীরা তা দেখে অবাকও হয়েছেন। তবে আয়াতে যে বলা হয়েছে কাফেরেরা আল্লাহর কুদরতকে অস্বীকার করবে সে বিষয়ে আকাশে ঘুরে আসা বিজ্ঞানীদের মতটা বুকাইলি সাহেবের লেখা থেকে বুঝা গেল না। তিনি সুরা আর রাহমানের ৩৩ নং আয়াতে বলেছেন যে “এখানে ‘লাও’ ব্যবহার করা হয়নি বরং ‘ইন’ ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে মানুষের পক্ষে মহাকাশ জয় করা সম্ভব” কিন্তু সুরা হিজর এর ১৪,১৫ আয়াতে তো ‘লাও ব্যবহার করা হয়েছে যা অসম্ভব বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। তা স্বত্ত্বেও তিনি সেখানে আসমান জয় করা মানুষের পক্ষে সম্ভব কিভাবে বললেন?



আমাদেরকে এখন কয়েকটি বিষয় জানতে হবে \* উল্লেখিত আয়াতে আকাশ জয়ের ইঙ্গিত আছে কিনা? \* আকাশ বলতে কি বুঝায়? \* বিজ্ঞানীরা এই পর্যন্ত মহা আকাশে যতটা ঘুরাঘুরি করেছে সেটাকে আকাশ বিজয় বলা যাবে কিনা? \* আয়াত গুলোতে উল্লেখিত আকাশ আর বিজ্ঞানীদের জয় করা আকাশ একই জিনিস কিনা? \* আয়াত গুলো বিজ্ঞানীদের ভ্রমণের পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ কিনা। তাহলে আয়াত গুলোর ব্যাখ্যায় অন্যান্য মুফাচ্ছেরিনে কেবলমাত্র কি বলেছেন সেটা আগে দেখা যাক। ফাতহুল কাদীরে বলা হয়েছে { السَّمَاوَاتِ أَقْطَارُ مَنْ تَنْفُذُوا أَنْ اسْتَطَعْتُمْ إِنَّ } والأرض } অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহর কুদরত আর আল্লাহর পাকড়াও থেকে পালিয়ে আসমান আর জমিনের সীমা থেকে বের হয়ে যেতে পার { فانفذوا } তাহলে বের হয়ে যাও এবং নিজেদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচিয়ে রাখা নাফাজ নفذ বলা হয় একটি জিনিস আরেকটি জিনিস থেকে বের হয়ে যাওয়া। যেভাবে তীর বের হয়ে যায়। { بِسُلْطَانٍ إِلَّا تَنْفُذُونَ لَا } অর্থাৎ শক্তি ছাড়া তোমরা তা পারবে না। তোমাদের কাছে সেই শক্তি নাই। মুফাচ্ছের ইবনে মুবারক বলেন, এই আয়াতে আখেরাতের কথা বলা

হয়েছে। আর মুফাচ্ছের আজজেহাক বলেন , এর অর্থ হবে তোমরা যদি মৃত্যু থেকে পালিয়ে যেতে পার তবে যাও। প্রসিদ্ধ মুফাচ্ছের ইবনে কাছীর এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন , অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম আর আল্লাহর কুদরত থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না। তিনি তোমাদেরকে ঘিরে রাখবেন। তোমরা তার পাকড়াও থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না। এবং আল্লাহর সালতানাত থেকে তোমরা বের হয়েও যেতে পারবে না। যেখানেই যাবে সেখানেই তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। এটা কিয়ামতের ময়দানের অবস্থা। ফেরেশতারা সাত লাইন হয়ে সমস্ত মাখলুখকে বেঁধে রাখবে। সুতরাং কেও পালাতে পারবে না। { لَطَانُ بِسْ إِلَّا } অর্থাৎ আল্লাহ তালার নির্দেশ [অনুমতি] ছাড়া। একই কথা সুরা কিয়ামতেও বলা হয়েছে, الْإِنْسَانُ يَقُولُ

( ۱۱ ) ( وَزَرَ لَا كَلَّا ) ۱۰ ( الْمَقْرُ أَيْنَ يَوْمَئِذٍ ) কোথায় ? না কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। কিয়ামাহ = আয়াত ১০, ১১ তাফসীরে কাশশাফে { وَالْإِنْسُ الْجَنِّ يَامْعَشَرَ } এই আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে হে জীন ও মানব তোমরা যদি আমার পাকড়াও আর আমার সালতানাত থেকে বের হয়ে যেতে পার তাহলে বের হয়ে যাও। তোমরা তা পারবে না। ফেরেশতারা তোমাদেরকে বেঁটন করে রাখবে।

এই ছিল সুরা আর রাহমানের ৩৩ নং আয়াতের বিভিন্ন মুফাচ্ছেরিনে কেরামের ব্যাখ্যা। আর সুরা হিজর এর ১৪, ১৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে ইবনে কাছীরে বলা হয়েছে এখানে আল্লাহ তালা কাফেরদের অহংকার, তাদের শক্ত কুফরি এবং জিদ সম্পর্কে বুঝাতে চেয়েছেন যে তাদের জন্য যদি আসমানের দরজাও খোলে দেওয়া হয় এবং তারা সেখানে আল্লাহ তালা বিস্ময়কর সব সৃষ্টি দেখে তবুও তারা আল্লাহর উপর ইমান আনবে না। বরং তারা বলবে আমাদের দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নেয়া হয়েছে, আমাদের দৃষ্টিভ্রম হয়েছে বা আমাদেরকে যাদু করা হয়েছে। আমরা যা দেখেছি সেটা বাস্তব নয়। আর তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে আল্লাহর কুদরত তাদের চোখের সামনে প্রকাশিত হবার পরেও তারা অস্বীকার করবে এবং বলবে এটা একটা যাদু। আসমানের দরজা খোলেও যদি তাদেরকে দেখানো হয় আর তারা যদি আসমানে ফেরেশতাদেরকে এবং আল্লাহর বিস্ময়কর সৃষ্টি সমূহ দেখে, তারপরেও তারা ইমান আনবে না। বরং তারা বলবে এটা অবাস্তব জিনিস হয়ত আমাদের দৃষ্টিভ্রম হয়েছে নাহয় আমরা যা দেখেছি তা বাস্তব নয়। যেভাবে তারা কোরানকে যাদু বলেছিল এখানেও তারা এই সব দেখে বলবে এটা যাদু।

দেখা গেছে মুফাসসেরিনে কেরাম উল্লেখিত আয়াত গুলোতে আসমানের উপরে উঠা মানুষের জন্য অসম্ভব বলেছেন। তবে কেও যদি আল্লাহর অনুমতি পায় তাহলে

তিনি উঠতে পারেনা যেমন রাসুল করীম সঃ মেরাজের সময় আসমানের উপরে উঠেছিলেন। হাদিসে আছে তিনি যখন মেরাজের রাতে হযরত জিবরাইল আঃ এর সাথে আসমানের দরজায় পৌঁছালেন সেখানে আসমানের দরজায় পাহারাদার ছিল এবং পাহারাদারেরা জিবরাইলের আঃ কাছে জিজ্ঞেস করেছিল আপনার সাথে কে? জিবরাইল বলেছিলেন যে তিনি মুহাম্মদ সঃ। তখন ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করেছিল উনার কি আল্লাহর পক্ষ থেকে উপরে আসার অনুমতি আছে? তখন জিবরাইল আঃ বলেছিলেন হ্যাঁ অনুমতি আছে।

তখনই ফেরেশতারা আসমানের দরজা খোলে দিয়েছিল। এ থেকেও বুঝা যায় যে মানুষের বানানো যন্ত্রপাতিকে আয়াতে উল্লেখিত সুলতান বলা হয় নি বরং আল্লাহর অনুমতি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত শক্তিকেই সুলতান বলা হয়েছে। যেটা ছাড়া আসমানে উঠা যাবে না। এবার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখা যাক মানুষ আকাশ জয় কতটা করেছে এবং সেটা কোরানে উল্লেখিত আয়াতের পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ কিনা। কোরানের বিভিন্ন আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি যে আসমানের দুটি অর্থ আছে। একটি অর্থ হচ্ছে আমাদের মাথার উপরের খোলা জায়গা। একই অর্থে

مِنْ وَأَنْزَلَ آيَاتٍ مِنْ رَبِّهِ فَتَعَالَى الْكُرْسِيُّ إِنَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَبِيرِ  
لَكُمْ رِزْقًا الثَّمَرَاتِ مِنْ بِهِ فَأُخْرِجَ مَاءً السَّمَاءِ

আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবো সূরা বাকারা = ২২ অন্য আয়াত وَمَا أَنْزَلَ

আর আল্লাহ তা'লা আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, তদ্বারা মৃত জমিনকে সজীব করে তুলেছেন সূরা বাকারা =

شَيْءٍ كُلِّ نَبَاتٍ بِهِ فَأُخْرِجْنَا مَاءً السَّمَاءِ مِنْ أَنْزَلَ الَّذِي وَهُوَ آيَاتٍ ۝ ১৬৪ অন্য আয়াত

তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি, সূরা ইনআম = ৯৯ এই আয়াত গুলোতে বলা হয়েছে আল্লাহ তালা আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। আমরা জানি যে মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। আর

মেঘ থাকে আমাদের মাথার কিছুটা উপরের দিকে খোলা আকাশে। এই খোলা আকাশকে আসমান বলে হয়েছে।

আবার কোরানের অন্য আয়াত থেকে আসমানের দ্বিতীয় একটি অর্থ বুঝা যায় সেটা হল আসমান একটি দরজা বিশিষ্ট বস্তু। অনেকটা ছাদের মত। স্তরে স্তরে তা বানানো হয়েছে। যাতে পাহারাদার নিযুক্ত আছে। সেটির অবস্থানও উপরের দিকে। এর পক্ষেও আয়াতে দলিল আছে। প্রথম দলিলটা আমাদের আলোচিত সূরা হিজর এর

وَنُؤْوَا فِيهِ يَعْرُجُ السَّمَاءِ مِّنْ بَابٍ عَلَيْهِمْ فَتَحْنَا وَلَوْ أَنَّهُمْ

۱۵ (لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ) ۱۴ (যদি আমি

ওদের সামনে আকাশের কোন দরজাও খুলে দেই আর তাতে ওরা দিনভর আরোহণ ও করতে থাকে। তবুও ওরা একথাই বলবে যে, আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটানো

হয়েছে, না বরং আমরা যাদুগ্রস্থ হয়ে পড়েছি। অন্য আয়াত إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا الَّذِينَ

الْجَمَلُ يَلْجَأُ إِلَى الْجَنَّةِ يَدْخُلُونَ أَوَّلَ السَّمَاءِ أَبْوَابُ لَهُمْ تَفْتَحُ لَهَا عَنْهَا وَاسْتَكْبَرُوا

۴۰ (النَّجْرَمِينَ نَجْزِي وَكَذَلِكَ الْخِيَاطِ سَمَّ فِي) (নিশ্চয়ই যারা আমার

আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং এগুলো থেকে অহংকার করেছে, তাদের জন্যে

আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যে পর্যন্ত

না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। আমি এমনিভাবে পাপীদেরকে শাস্তি প্রদান

করি। সূরা আল আরাফ = ৪০ আরেকটি আয়াত وَجَعَلْنَا سَقْفًا السَّمَاءِ وَجَعَلْنَا

۳২ (مُعْرَضُونَ آيَاتِهَا عَنْ وَهُمْ) (আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি; অথচ

তারা আমার আকাশস্থ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। সূরা আল আশ্বিয়া =

২৩ আরেকটি আয়াত , تَطْبَاقُ السَّمَاوَاتِ سَبْعَ خَلْقَ الَّذِي , তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে

স্তরে সৃষ্টি করেছেন। সূরা মুলক = ৩ এই আয়াত গুলোতে বুঝা যাচ্ছে আসমান

একটি ছাদের মত বস্তু। যাতে দরজা আছে এবং দরজায় পাহারাদার নিযুক্ত আছে।

তাহলে আমরা আসমান শব্দের দুটি অর্থ পেলাম। একটি হচ্ছে খোলা আকাশ।

আরেকটি হচ্ছে দরজা বিশিষ্ট আকাশ। যদিও বিজ্ঞানীরা এই দ্বিতীয় অর্থের আসমানটাকে স্বীকার করে না। কারণ তাদের দৃষ্টি সীমায় এখনো সেই আসমান আসেনি। বিজ্ঞানীরা আবার কিছু না দেখে বা যন্ত্রপাতির মাধ্যমে হলেও কিছুর অস্তিত্ব বুঝতে না পারলে তা আছে বলে মনে করেন না। তাই তাদের মতে আসমান হচ্ছে খোলা আকাশ। আর দ্বিতীয় অর্থে দরজা বিশিষ্ট আসমান বলতে তাদের কাছে কিছুই নাই। এটিও একটি কারণ হতে পারে ডাঃ মরিস বুকাইলি সাহেবের বিজ্ঞানীদের পক্ষে আকাশ জয়ের দাবী করার।

### **চাদ ও কথিত মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার প্রশ্নই আসেনা:**

আল্লাহ বলছেন, অনুমতি ব্যাতিত কেউ প্রাপ্ত সীমা পার হতে পারবেনা। অর্থাৎ পৃথিবীর চারপাশে ও উপরের দিকে শেষ সীমানা কেউ পার হতে পারবেনা। শুধুমাত্র আল্লাহ যাকে অনুমতি প্রদান করবেন, সে ব্যাতিত।

তাহলে, কোরআনকে উপেক্ষা করে কথিত বিজ্ঞানীদের কথায় এতো আস্থা কেন?

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَاللّٰرِ السَّمَاوَاتِ اِرْأَقُطْ مِنْ تَنْفُؤُوا اَنْ اسْتَطَعْتُمْ اِنْ وَالْاِنْسِ الْجِنَّ مَعْشَرَ يَا  
بِسُلْطَانٍ اِلَّا تَنْفُؤُونَ لَا فَانْفُؤُوا ض

অর্থ: "হে জিন ও মানবকুল, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের প্রাপ্তসীমা অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম করা কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না"। সূরা আর রাহমান, ৩৩।

সুরা আর আর রাহমানের ৩৩ নং আয়তটির ব্যাখ্যায় তাফসিরে তাবারিতে লেখা হয়েছে, **والأرض، السموات أطراف وات جوز أن اسد تطع تم إن**، **ذلك، ف جوزوا على يكم؛ ي قدر لا حتى رب كم ف تعجزوا** অর্থ: যদি আসমান ও জমিনের সীমানা অতিক্রম করে আল্লাহকে তোমাদের বিচারে অক্ষম করে দিতে পার, তাহলে অতিক্রম করে দেখাও। কিন্তু তোমরা তা পারবে না আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত।

#### ◆ কঠিন ছাদ

"যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে শয্যা ও আকাশকে ছাদ স্বরূপ করেছেন এবং যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, ...." (সূরা বাকারাহ, অধ্যায় ২, আয়াত ২২)  
"এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ..." (সূরা আশ্বিয়া, অধ্যায় ২১, আয়াত ৩২)

অর্থ্যাৎ, আকাশ হলো একটি ছাদ। এটা কঠিন পদার্থের সুরক্ষিত ছাদ। আর এই ছাদ হতেই বৃষ্টি বর্ষণ হয়।

আসমান একটি দরজা বিশিষ্ট বস্তু | অনেকটা ছাদের মত | স্তরে স্তরে তা বানানো হয়েছে। যাতে পাহারাদার নিযুক্ত আছে। সেটির অবস্থানও উপরের দিকে। এর পক্ষেও আয়াতে দলিল আছে। সূরা হিজর এর ১৪ ও ১৫ নং আয়াত:

إِنَّمَا لَقَالُوا (14) جُونِ يَعْرِ فِيهِ لُؤَافِظُ السَّمَاءِ مِّنْ بَابَا عَلَيْهِمْ فَتَحْنَا وَلَوْ  
مَسْحُورُونَ قَوْمٌ نَحْنُ بَلْ أَبْصَارُنَا سُكِّرَتْ

"যদি আমি ওদের সামনে আকাশের কোন দরজাও খুলে দেই আর তাতে ওরা দিনভর আরোহণ ও করতে থাকে তবুও ওরা এ কথাই বলবে যে, আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে, না বরং আমরা যাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছি"। অন্য আয়াতে,

يَدْخُلُوْا السَّمَاءِ اَبْوَابُ لَهُمْ تُفْتَحُ لَا عَنْهَا وَاسْتَكْبَرُوْا بِآيَاتِنَا كَذَّبُوْا الَّذِيْنَ اِنَّ  
الْمُجْرِمِيْنَ زِيْنَجُ وَكَذٰلِكَ ۚ الْخِيَاطِ سَمِّ فِي الْجَمَلُ يَلْجَحْ حَتَّى الْجَنَّةِ نَ

অর্থ: "নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং এগুলো থেকে অহংকার করেছে, তাদের জন্যে আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করো আমি এমনিভাবে পাপীদেরকে শাস্তি প্রদান করি"। সূরা আরাফ, ৪০। আরেকটি আয়াত,

طَبَاقًا سَمَآوَاتٍ سَبْعَ خَلَقَ الَّذِي

"তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন"। সূরা মুলক, আয়াত : ৩। এ আয়াতগুলোতে বুঝা যাচ্ছে, আসমান একটি ছাদের মত বস্তু যাতে দরজা আছে এবং দরজায় পাহারাদার নিযুক্ত আছে।

আল্লাহ বলেনঃ

نَا السَّمَاءِ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُوْنَ وَجَعَلْ

আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি; অথচ তারা আমার আকাশস্থ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে[২১:৩২]

মুমিনরা বলে সুরক্ষিত ছাদ আর কাফেররা বলে ভ্যান এলেন বেল্টা মানুষ কাফেরদেরটা মেনে নেয়, কিন্তু মুমিনদেরটা মেনে নিতে আপত্তি।

উপরন্তু আয়াত এবং লিখা গুলো পড়ে যেকোনো বিবেকবান মুমিন খুব সহজেই বুঝতে পারছেন যে, আসমানকে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। সেটা কেউ পার হতে পারবেনা। সুতরাং কাফেরদের চাঁদে যাওয়া , মহাশূন্যে ঘুরাঘুরি করা আর মঙ্গলে যাওয়ার ভিডিওগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা। অথচ অত্যাধুনিক মুসলমানেরা কোনো ভাবেই এ কথা মানতে চায়না। এতো সুস্পষ্ট আয়াত দেখার পরেও তারা অপবিজ্ঞানীদের মিথ্যা ভিডিও গুলোকেই বিশ্বাস করে।

"Van Allen Belts" are nothing  
more than the dome built by God"  
-Brett Salisbury c.s.n. c-3,  
Ex-U.S. Intelligence

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, কথিত বিজ্ঞানীরাই এখন স্বীকার করছে যে তারা চাঁদে তো দূরের কথা লো আর্থ অরবিটই অতিক্রম করতে পারেনি। তারপরেও বিজ্ঞানপ্রেমীরা পুরোনো সেই কল্পকাহিনীকে আঁকড়ে ধরে আছে। হায় আফসোস। এরা কুরআনের দিকে তাকায়ই না। অপেক্ষায় থাকে বিজ্ঞানীরা কখন একটা থিওরি দিবে আর তা ইসলামাইজড করে নিবে।



## চাঁদে অবতরণ ছিল সিনেমা, দৃশ্য ধারণ করেছি আমি:



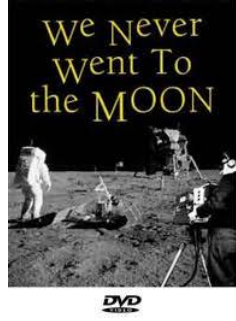
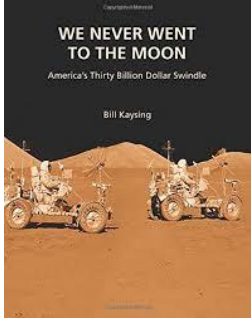
মার্কিনীদের চাঁদে অবতরণ ইস্যুতে আমেরিকার বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক স্ট্যানলি কুবরিকের একটি সাক্ষাৎকার নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন, মার্কিনীদের চাঁদে অবতরণের পুরো ঘটনা ছিল সিনেমা। তিনি নিজেই ওইসব দৃশ্য ধারণ করেছিলেন। তার মতে, সিনেমার স্ক্রিপ্টের মতো করে ঘটনাটি সাজানো হয়েছিল। চলচ্চিত্র নির্মাতা টি. প্যাট্রিক মিউরে সম্প্রতি ওই সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করেছেন। প্যাট্রিক মিউরে দাবি করেছেন, ১৯৯৯ সালে মৃত্যুর তিন দিন আগে স্ট্যানলি কুবরিক তাকে এ সাক্ষাৎকারটি দিয়েছিলেন। কিন্তু এতদিন তিনি তা প্রকাশ করেননি। তবে স্ট্যানলি কুবরিকের স্ত্রী ক্রিস্টিনা কুবরিক বলেছেন, তার স্বামীর সাক্ষাৎকারটি বানোয়াট। তিনি এ ধরনের কোনো সাক্ষাৎকার দেন নি বলে দাবি করেছেন ক্রিস্টিনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৯ সালে চাঁদে মানুষ পাঠানোর দাবি করে। কিন্তু বিশ্বের বহু বিজ্ঞানীই যুগে

যুগে এর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাদের মতে, নাসার মাধ্যমে আমেরিকার চাঁদে মানুষ পাঠানোর ঘটনাটি ছিল শুধুই সাজানো নাটক। উন্নত বিশ্বের অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা চাঁদে যাওয়ার এই নাটকের শুটিং করা হয়েছিল দুর্গম কোনো মরু অঞ্চলে, যেখানে নাটক সাজালে কেউ বুঝতে পারবে না। হলিউডে মার্কিন পরিচালকরা এত অবিশ্বাস্য সব সিনেমা তৈরি করে থাকেন যে তাদের পক্ষে এরকম একটি চন্দ্র বিজয়ের শুটিং করা খুবই সহজ ব্যাপার।



কিছু কিছু বিজ্ঞানী এই চন্দ্র বিজয় নাটকের পরিচালকের কথা বলেছিলেন। তারা দাবি করেছিলেন, এই মিথ্যা কাহিনীর পরিচালক ছিলেন বিখ্যাত মার্কিন পরিচালক স্ট্যানলি কুবরিকা। এবার সেই কুবরিকের সাক্ষাৎকার প্রকাশ হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞানীরা নাসার সমালোচনা করে বলেন, ১৯৬৯ সালে নাসার এমন কোনো উন্নত প্রযুক্তি ছিল না যা দিয়ে মানুষ চাঁদে গমন করতে পারে। এপোলো-১১ নামের মহাকাশ যানটি ছিল সাজানো নাটকের অংশ। মানুষ সত্যিই চাঁদে গেছে নাকি এটা বিশ্বের মানুষের সঙ্গে ইতিহাসের সবচেয়ে

বড় প্রতারণা সেটা আরো বেশি ঘনীভূত হয় মার্কিন রকেট প্রযুক্তি তত্ত্বের প্রবক্তা বিল কেসিংয়ের বক্তব্যের পর।

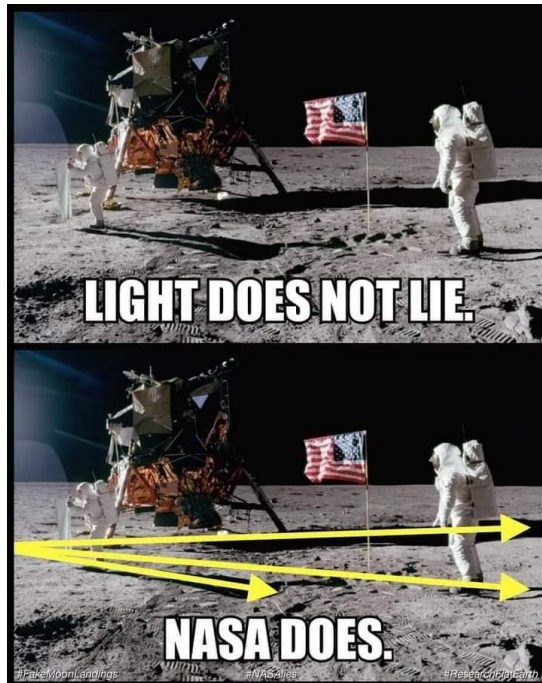
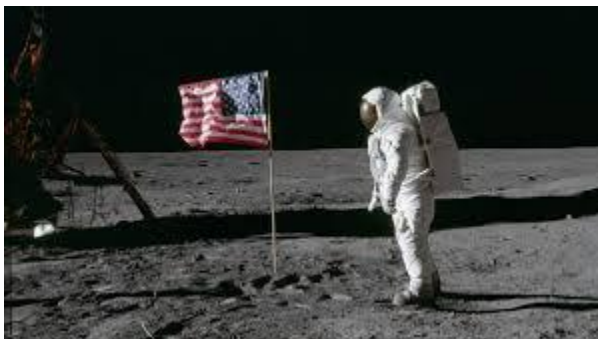


১৯৭৪ সালে তিনি একটি বই লেখেন আমেরিকার ৩০ বিলিয়ন ডলারের জোচ্ছুরি শিরোনামে। এই গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন আমরা কখনই চাঁদে যাইনি। চাঁদে যাওয়ার বিষয়টি ছিল বিশ্ববাসীর সঙ্গে প্রতারণা। তিনি আরো উল্লেখ করেন এপোলো-১১ মহাকাশ যানটি উৎক্ষেপণের কিছু সময় পর যানটি অদৃশ্য হয়ে যায়। এরপর তিন নভোচারী বিশিষ্ট লুনার ক্যাপসুলটি একটি সামরিক কার্গো বিমানে সরিয়ে ফেলা হয় এবং আট দিন পর ক্যাপসুলটি প্রশান্ত মহাসাগরে ফেলে দেয়া হয়। তারপর নভোচারীদের নিয়ে নেভাদার মরুভূমিতে কঠোর সামরিক প্রহরার মধ্য দিয়ে চন্দ্র বিজয়ের নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়। মহাকাশচারীরা চাঁদে অবতরণ করার পর সেখানে তাদের কয়েকটি ছবি ও ভিডিও তোলা হয় এবং চন্দ্র থেকে তারা কয়েকটি পাথর সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। এই ছবি, ভিডিও ও পাথরগুলো তাদের সত্যিকারের চাঁদে যাওয়ার প্রমাণ বহন করে। যারা চাঁদে মানুষ অবতরণকে সাজানো নাটক বলে মনে করেন, তারা এর পক্ষে প্রমাণ হিসেবে বেশ কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। পৃথিবী থেকে আমরা রাতের আকাশে নক্ষত্র বা তারকা দেখতে পাই সুতরাং

চাঁদের রাতের আকাশে তারকাগুলোকে আরো উজ্জ্বল দেখানোর কথা।  
কিন্তু নভোচারীরা চাঁদে গিয়ে যে ছবিগুলো তুলেছেন তাতে কোনো  
ছবিতে চাঁদের আকাশে তারকা দেখা যাচ্ছে না।



চাঁদ থেকে ফেরার পর মহাকাশচারীরা বলেছিলেন সেখানে কোনো  
অক্সিজেন বা বাতাস নেই ফলে সেখানে স্বাভাবিক অবস্থায় এক মিনিটও  
বাঁচা সম্ভব নয়। কিন্তু চাঁদে থাকতে মহাকাশচারীদের যে ছবি তোলা  
হয়েছিল তাতে দেখা যায় চাঁদে তাদের পুঁতে রাখা মার্কিন পতাকা  
বাতাসে উড়ছে।



তাহলে চাঁদে বাতাস না থাকলে তাদের পতাকা বাতাসে উড়ছিল কীভাবে সেটা কি তাহলে পৃথিবীর বাতাস ছিল! ছবিতে দেখা যায় নভোচারীরা যেখানে অবতরণ করেছিলেন সেখানে পাশাপাশি বস্তুগুলোর ছায়া পরস্পরকে ছেদ করেছে এবং বিভিন্ন বস্তুর ছায়া বিভিন্ন দিকে গেছে। কিন্তু চাঁদে শুধু আলোর উৎস সূর্য হয়ে থাকলে বস্তুর ছায়া পরস্পরকে ছেদ না করে সমান্তরাল হওয়ার কথা। তাহলে কি সেখানে শুটিং করার সময় কৃত্রিম আলো ব্যবহার করা হয়েছিল! মানব ইতিহাসে চন্দ্র বিজয় ছিল সবচেয়ে বড় ঘটনা তারপরও এই অভিযানের টেলিমেট্রি ডাটা পরে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। অবশ্য নাসা বলেছিল এই ডাটা তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। কিন্তু এমন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ডাটা তাদের কাছ থেকে কীভাবে হারিয়ে যায় সেটা একটি প্রশ্নের বিষয়। এ সব বিষয়গুলো ছাড়াও ছোটখাটো অনেক অমীমাংসিত প্রশ্ন লুকিয়ে আছে চন্দ্র বিজয় কাহিনীতে। চন্দ্র বিজয় কর্মকাণ্ডে জড়িত নভোচারীদের মধ্য থেকে গাস গ্রিসাম নামের এক নভোচারী চন্দ্র জয়ের পর নিহত হন। অনেকের ধারণা, তিনি আমেরিকার ওই প্রতারণার কথা বিশ্বকে জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তাই তাকে কৌশলে হত্যা করা হয়েছিল। চন্দ্র জয় প্রসঙ্গে এ ধরনের আরও নানা প্রশ্ন রয়ে গেছে যেগুলোর যৌক্তিক জবাব এখনও দিতে পারে নি আমেরিকা। - সূত্র : আইআরআইবি

link:

<https://www.kalerkantho.com/amp/online/world/2015/12/31/308196>



## নীল আর্মস্ট্রং কে নিয়ে মুসলিমসমাজে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা ও যুক্তিখণ্ডন :-



আমাদের মুসলিম সমাজে একটি কথা খুবই প্রচলিত এবং জনপ্রিয় যে, বিখ্যাত মার্কিন নভোচারী নীল আর্মস্ট্রং একজন মুসলিম ছিলেন। বলা হয়ে থাকে, তিনি চাদে আযান শুনতে পান এবং পরবর্তিতে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হন। এটা শুধু সাধারণ জনগনের কাছেই নয় বরং বড় ইসলামী উস্তাদেরও এর পক্ষে কথা বলেন। সাথে এও বলা হয়ে থাকে যে, তিনি নাকি চাঁদের দ্বিখণ্ডিত হওয়ার দাগও দেখতে পেয়েছিলেন।

চলুন একটু ফ্ল্যাশব্যাকে গিয়ে তাদের ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করা যাক।



প্রথমেই আমরা যদি বিজ্ঞানীদের কথা মেনে নেই তাহলে দাঁড়ায়, চাঁদে কোন বাতাস নেই। শব্দের প্রবাহিত হওয়ার জন্য একটি মাধ্যমের প্রয়োজন। বায়ুশূন্য স্থানে

বা ভ্যাকুয়ামে কোন মাধ্যম না থাকায়, সেখানে সাউন্ড ওয়েভ পাস করবে না, বা প্রবাহিত হবে না। তাই চাঁদে কেউ আজান বা শব্দ করলে, সেটি শোনা যাবে না। এই পরীক্ষাটি নিজের বাসায় করে দেখতে পারেন, বায়ুশূন্য স্থানে আসলেই আজান শোনা সম্ভব কিনা। সেই আজান আবার নভোচারীদের পোষাক ভেদ করে নিল আর্মস্ট্রং এর কান পর্যন্ত পৌঁছালো, যা নিতান্তই হাস্যকর দাবী। কোনো স্কলার এখন পর্যন্ত এই দাবীর সপক্ষে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন নি যে, নিল আর্মস্ট্রং মুসলিম হয়েছিলেন, কিংবা উনি নামাজ পড়েছেন, বা কলেমা পড়েছেন। দাবী যারা করে, প্রমাণ দেয়ার দায়িত্ব তাদেরই। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন প্রমাণ আমরা পাই নি। তবে এর বিপক্ষে প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গেছে।



১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট হতে ইসলামিক বিশ্বের সকল দূতাবাসগুলোতে নিচের এই চিঠিটি প্রেরন করা হয়েছিল। যার ভাবানুবাদ :

" কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত, কোন ধর্মের মানুষকে অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা বা কাউকে ক্ষুব্ধ করা থেকে বিরত থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টাকে সামনে রেখে আর্মস্ট্রং ডিপার্টমেন্টকে পরামর্শ দিয়েছেন এই বিষয়টি পরিষ্কার করতে যে, তার ইসলাম গ্রহণ করার খবরটি অসত্য। সেইসাথে, ভবিষ্যতে এরকম কোন পরিকল্পনাও উনার নেই যে, ভিন্ন কোন দেশে গিয়ে তিনি ইসলামিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করবেন।"

সেই সাথে, এশিয়ান রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক ফিল পার্শাল এর কাছে নিল আর্মস্ট্রং এর পক্ষ হতে এডমিনিস্ট্রেটিভ এইড এর ভিভিয়ান হোয়াইট এর পাঠানো চিঠিটিও এখানে যুক্ত করা হলো। উল্লেখ্য, নিল আর্মস্ট্রং এর ঠিকানা এখানে লেবানন ( LEBANON ), দেখে কেউ কেউ ধারণা করতে পারেন, নিল আর্মস্ট্রং লেবানন নামক দেশে বসবাস করেন। যা সত্য নয়। এই লেবানন হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি জায়গার নাম।

NEIL A. ARMSTRONG  
LEBANON, OHIO 45036

July 14, 1983

Mr. Phil Parshall  
Director, Asian Research Center  
International Christian  
Fellowship 29524 Bobrich  
Livonia, Michigan 48152

Dear Mr. Parshall:

Mr. Armstrong has asked me to reply to your letter and to thank you for the courtesy of your inquiry. The reports of his conversion to Islam and of hearing the voice of Adzan on the moon and elsewhere are all untrue.

Several publications in Malaysia, Indonesia and other countries have published these reports without verification. We apologize for any inconvenience that this incompetent journalism may have caused you. Subsequently, Mr. Armstrong agreed to participate in a telephone interview, reiterating his reaction to



these stories. I am enclosing copies of the United States State Department's communications prior to and after that interview.

Sincerely

Vivian White

Administrative Aide

জার্নাল এরাবিয়া, দ্য ইসলামিক ওয়ার্ল্ড রিভিউ, প্রকাশকাল জুন ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ,  
পৃষ্ঠা ৫ এ সম্পাদক এই চিঠিটি প্রকাশ করে লিখেন;

### A MUSLIM OVER THE MOON?

“Arabia” is by far the superior newsmagazine regarding what is going on in the Muslim world today. Your reporting is extremely thorough and seeks to be as objective as possible. Your willingness to criticize political policies as well as religious happenings in the Muslim world is refreshing. As an American I would feel your slant on the West is basically fair. It would be most helpful if you would dispel a misconception prevalent in almost all Muslim countries. From Morocco to the Philippines it is commonly believed that Neil Armstrong heard the Azan on the moon, converted to Islam and is now engaged in the full-time propagation of the Muslim faith.

The US State Department has issued a memo saying that the story about Armstrong's conversion was untrue. The memo said “While stressing his strong desire not to offend anyone or show

disrespect for any religion, Armstrong has advised department that reports of his conversion to Islam are inaccurate.” The memo further says, “if post receives queries on this matter, Armstrong requests that they politely but firmly inform querying party that he has not converted to Islam and has no current plans or desires to travel overseas to participate in Islamic religious activities.”

N.B. The memo was sent to all our diplomatic and consular posts.

Dr Phil Parshall

Director, Asian Research Centre Manila, Philippines.

আশা করি বুঝতে অসুবিধা হবে না যে নীল আর্মস্ট্রং একজন খ্রীস্টান ছিল এবং ইসলাম ধর্মের প্রতি তার কোনো অনুরাগও ছিল না,যেটা আজকালকার

হয়ুর,আলেমদের মতের পরিপন্থী।



এমনকি, সবচাইতে বিখ্যাত ইসলামি ওয়েবসাইট [Islamqa.info](http://Islamqa.info) পর্যন্ত স্বীকার করেছে যে, এই বিষয়ে কোন তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় নি। [ ১ ]

সবথেকে বড় কথা হল, ২০০৫ সালে প্রকাশিত **First Man: The Life of Neil A. Armstrong** গ্রন্থে, যেটি উঁনার অফিশিয়াল জীবনীগ্রন্থ, তিনি সেখানে পরিষ্কার করেছেন যে, তার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মিথ্যা

বানোয়াট [২]

তথ্যসূত্র:

[১]-Is the story that the astronaut Neil Armstrong became Muslim true?islamiqua.info

[২]- James R. Hansen – First Man: The Life of Neil A. Armstrong – Simon & Schuster, 2005, pp 630-632, ISBN 9780743256315

### **মহাশূন্যে নভোচারীদের মানবেতর জীবন যাপন :**

মহাশূন্যে নভোচারীরা প্রসাব পায়খানা কিভাবে করে? যেখানে কোন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নাই, সেখানে প্রসাব পায়খানা নিচের দিকে বের হয় কি করে?

মহাকাশে রয়েছে আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন... এটি শূন্যে অবস্থান করে পৃথিবীকে আবর্তন করছে।

এখানে চারটি ল্যাব রয়েছে, যেগুলোতে আমেরিকা, জাপান, ইইউ আর কানাডার বিজ্ঞানীরা মহাকাশ নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত।

প্রায় জিরো মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এখানে (মাইক্রোগ্রাভিটি)। ফলে এটার ভেতর বিজ্ঞানী বা নভোচারীরা ভেসে থাকে।

প্রসাব-পায়খানা সবচেয়ে আরামের বিষয় হলেও, এখানে টয়লেট ব্যবহার করা বেশ ঝামেলারই।

প্রথমে কমোডে বসে সিটবেল্ট বাঁধতে হয়, যাতে কাজ করার সময় ভেসে উড়ে না যায়।



নাস্কার ওয়ান (প্রসাব) কাজের জন্য একটি লম্বা ফানেলের মত জিনিস থাকে। সেটি মুত্রনালীর মুখের সামনে ধরতে হয়। ফানেলের সাথে চুষে নেওয়ার জন্য সাকার মেশিন লাগানো থাকে। এরপর প্রসাব করা শুরু করলে সেটা সাকারের সাহায্যে টেনে নেয়।

নাস্কার টু কাজের জন্য কমোডে একই রকমের সাকার মেশিন থাকে। এর সাথে একটি বিশেষ ব্যাগ থাকে, যেখানে পায়খানাগুলো সংগ্রহ হয়। এরপর সেটিকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় শুকিয়ে নষ্ট করে ফেলা হয়।

সবচেয়ে মজার বিষয় হল, মহাশূন্যে পানি একটি দামী জিনিস। তাই সকলের প্রসাব একটি ট্যাঙ্কে জড়ো হয়। সেখানে জীবাণুমুক্ত ও পরিষ্কার করে প্রসাব থেকে শুধু পানি অংশটুকু বের করে নিয়ে সেটা খাবার পানির রিজার্ভ ট্যাঙ্কে গিয়ে যোগ হয়। সেগুলোই আবার খাওয়া হয় কিংবা অন্যান্য কাজে ব্যবহার হয়।

তবে এর চেয়ে বেশি অবাকের জিনিস হল, প্রসাব পায়খানা করতে বিশেষ ব্যবস্থার

প্রয়োজন হলেও মেয়ে নভোচারীদের পিরিওডের ব্লিডিং কিন্তু নরমালিই হয়। এটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখন পর্যন্ত বের করা যায় নি।

ঘুমানোর ক্ষেত্রে উপর নিচ, দাঁড়ানো বা শুয়া বলতে কিছু নাই। স্লিপিং কম্পার্টমেন্টের ভেতর গিয়ে পা উপরে মাথা নিচে করে উল্টো হয়ে ঘুমাতে পারেন কিংবা দাঁড়িয়েও ঘুমাতে পারেন। সব অনুভূতি একই রকম।



খাবার খেতে কোন টেবিল লাগে না। শূন্যে ভেসে থাকা প্লেট থেকেই খাবার খাওয়া যায়। তবে প্রত্যেকটি জিনিসের সাথে চুম্বক লাগানো, যাতে সেগুলোকে সহজেই স্পেস স্টেশনের লোহার দেয়ালের সাথে আটকে রাখা যায়। তবে খাওয়ার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হয় যাতে খাবারের কোন অংশ কোথাও উড়ে না যায়। এতে কোন একটা যন্ত্রের মধ্যে ঢুকে গিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

খাবারগুলো সাধারণত পৃথিবী থেকে প্লাস্টিকব্যাগে প্যাকেটজাত করে পাঠানো হয়। টিন বা ক্যান জাতীয় খাবার পাঠানো হয় না ওজনে ভারী ও পরিবহণ খরচ বেশি হবে বলে।

স্পেস স্টেশনের ভেতর খাবারগুলো গরম করার জন্য ওভেন আছে। সেখানে যার যখন দরকার খাবার গরম করে নেয়।



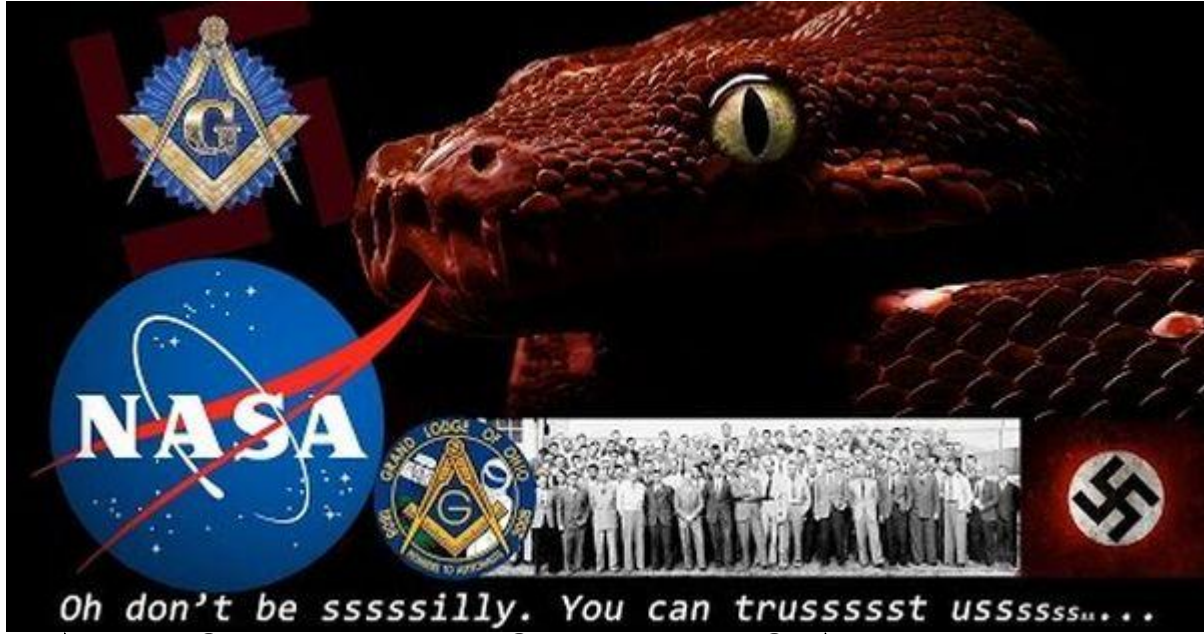
স্পেস স্টেশনে গোসল করা আরেক বিপত্তি। পৃথিবীর মত শাওয়ার ছেড়ে আরামে গোসলের সুবিধা নেই। মাইক্রোগ্রাভিটির কারণে পানি শাওয়ারের মত বেরও হবে না। তাছাড়া পানি নিয়ে যাওয়াও অনেক ব্যয়বহুল। পানি সেভ করার জন্য দাঁতমাজার টুথপেস্টকেও এমনভাবে বানানো হয়, যাতে তা খেয়ে ফেলা যায়। গোসলের জন্য বিশেষ প্লাস্টিক ব্যাগে পানি থাকে। তোয়ালেয় ভিজিয়ে সেটি দিয়ে গোসল করতে হয়। সাবান শ্যাম্পুগুলো এমনভাবে তৈরি যে ফেনা তৈরি হয় না এবং ব্যবহারের পর না ধুয়ে শুধু মুছলেই চলে। আসলে মধ্যাকর্ষন জিনিসটার যে কত উপকার তা আমরা পৃথিবীতে বসে টের পাই না। এই মধ্যাকর্ষণের ফলেই আমরা সাচ্ছন্দে পৃথিবীতে সুন্দরভাবে বসবাস করতে পারছি।

**RM:** উপরের লিখাটি পরে, আপনি হাসবেন নাকি কানবেন সেটা আপনার ব্যাপার। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো এটা যে ভাই লিখেছেন, তিনি এগুলো বিশ্বাস তো করেনই উল্টো আরো কিছু বিষয় ইসলামের সাথে মিলিয়ে শুকরিয়া আদায় করেছেন। অবশ্য উনার আলোচনায় বুঝা গেছে যে , উনি নাসার এইসকল ভণ্ডামি সম্পর্কে জানেন না। সুতরাং উনাকে দোষ দেয়ার সুযোগ নেই। শুধু কি এই ভাই? এরকম তো লক্ষ লক্ষ ভাই আছেন যারা এসব ব্যাপারে জানেননা। অথচ একটু সূক্ষ্ম ভাবে চিন্তা করলেই বিষয়গুলোর অসারতা বুঝা যায়। এবং সবকিছু যে স্টুডিওতে তৈরী করা নাটক, সেটাও বুঝতে মোটেও অসুবিধা হয়না।

### **প্রতারণা নাসার অন্ধকারাচ্ছন্ন পথচলা যেভাবে শুরু হয়:**

স্পেস হলো সাইন্টিজমের ফিলোসফিক্যাল পিলারগুলোর মধ্যে অঘোষিত রাজা। বর্তমানের ইভল্যুশন, বিগ ব্যাং, হলোগ্রাফিক ইউনিভার্স, এলিয়েনিজম, অ্যানাক্সিমান্ডারসের প্লুরালিজম- যেটাই বলেন না কেন, সাইন্টিজমের অধিকাংশ কুফরী মতবাদের ভিত্তিই হলো স্পেসের ধারণা।





একটা সময় ছিল যখন স্পেস সম্বলিত যে কোনো কিছুই পাওয়া যেতো শুধুমাত্র যাদুর কিতাবাদি যেমন কাব্বালাহর জোহার কিংবা হামেটিসিজমের এমারেন্ড ট্যাবলেট, কিংবা ইন্ডিয়ান মুশরিকদের জ্যোতির্বিদ্যায়, ও ন্যাচারাল

ফিলোসফারদের মতো অ্যাডভান্স লেভেলের যাদুকরদের গবেষণার খাতায়।

গ্যালিলিও-কোপার্নিকাস-নিউটনদের বদৌলতে তাদের গুরু পিথাগোরাসের

হেলিওসেন্ট্রিজম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া শুরু করে। পরবর্তীতে যখন জেসুইট প্রভাবের কারণে বিশ্ব থেকে জিওসেন্ট্রিক কসমোলজি অপরিচিত ও হাসির খোরাক হতে শুরু করে, তখনই পুনর্জন্ম হয় জুডিও-ব্যাবিলনীয়ান মিস্টিসিজম কাব্বালাহর

সোলার সিস্টেমের। স্বাভাবিকভাবেই তখনই স্পেসের ধারণাটা সবার নিকট স্থান

পেতে থাকে। জেসুইট প্রভাবের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুরু হয় হেলিওসেন্ট্রিক

কসমোলজির ব্রেনওয়াশ কার্যক্রম। ধীরে ধীরে মুখ্য জনতা তা গ্রহণ করে নেয়।

এতে এক সময় আসে যখন সমতল বিস্তৃত জমীনের কথা বলাটা পাগলামি হিসেবে

ধর্তব্য হওয়া শুরু হয়। টিভি উদ্ভাবনের পর হলিউড মুভিগুলো স্পেস ফ্যান্টাসিকে



মানুষের মাথায় ঢুকানোর জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে। স্পেস রিলেটেড কোনো মুভি মানেই সেটি ইভল্যুশন, স্পেস এম্পায়ার, এলিয়েনিজমে ভরপুর থাকবে। একটি মুভি, হাজারো কুফরের প্রচারণা। আইজ্যাক আসিমভ, কার্ল স্যাগান, এদের মতো অভিশপ্তদের কারণে গ্যালাক্টিক এম্পায়ারের কনসেপ্টও মানুষের মাথায় ঘুরা শুরু করে।



শয়তান তার কাষসিদ্ধির জন্য আশ্রিকাকে ঘাটি হিসেবে গ্রহণ করেছে। এজন্য এসব বিষয়ে আশ্রিকার হাত লক্ষণীয়।

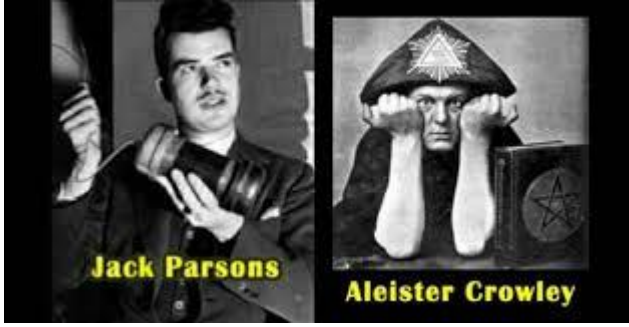
প্রথম দিকে শুধু টিভি আর সাইন্সফিকশনে স্পেস ট্রাভেল থাকলেও রকেট সাইন্টিস্টদের বদৌলতে কথিত স্পেস ট্রাভেলের নাটক শুরু হয়, যেটা মানুষের মাইন্ড কন্ট্রোল করা শুরু করে আরো তীব্রভাবে, শক্তভাবে মানুষকে স্পেস ট্রাভেলে বিশ্বাস করা এক প্রকার বাধ্য করে। কেননা, কয়েক দশক ধরে সাইন্স ফিকশন ও টিভিতে স্পেস ট্রাভেলের ব্যাপারে ব্রেনওয়াশ চলছিল, যার চূড়ান্ত রূপ লাভ হয় তখন যখন নাসার মতো স্পেস এজেন্সিগুলো তাদের স্পেস ট্রাভেলের

জায়ান্ট ড্রামা সফলভাবে সম্পন্ন করে এবং মিডিয়ার প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে তা সত্য হিসেবে ছড়িয়ে দিতে সফল হয়।



স্পেসের ধারণা, একটি ওয়ার্ল্ডওয়াইড ডিসিপশন, যা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে স্পেস এজেন্সিগুলো। আমরা সবাই জানি, নাসা ইতিহাসে এবং বর্তমানে সবচেয়ে প্রভাবশালী স্পেস এজেন্সি। নাসা তার স্টেজড ড্রামা, সিজিআই, ম্যাথমেটিক্যাল আইওয়াশ, ফটোশপ, পেইন্টিং এবং মিডিয়ার জোরে তাদের প্রতারণা ছড়িয়ে দিতে থাকে।

এই প্রতারক নাসার ইতিহাস ঘাটলে চলে যেতে হয় রকেট উদ্ভাবনের ইতিহাসে। রকেট কিংবা স্পেসশিপের আবিষ্কার একটি নতুন যুগের জন্ম দেয়, তা হলো স্পেস এজা এবং ভয়ংকর সত্য হলো এই স্পেস এজের ফাদার হলো এক অভিশপ্ত ও শয়তানের পূজারী, নাম তার জ্যাক পার্সন। এই জ্যাকের সাথে আরেক মালাউনের সখ্যতা ছিল উল্লেখযোগ্য, সে হলো অ্যালিস্টার ক্রোওলি। জ্যাক পার্সন ছিল একাধারে রকেট প্রোপালশন রিসার্চার, রকেট ইঞ্জিনিয়ার, কেমিস্ট এবং থেলেমাইট অকাল্টিস্ট। আর ক্রোওলি ছিল থেলেমা যাদুশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং একই সাথে সিরোমোরিয়াল যাদুকর, চিত্রকর, ঐপন্যাসিক, কবি এবং মাউন্টেইনার।



ক্রোওলি যাদুবিদ্যায় দক্ষতা অর্জনের জন্য সারা বিশ্বে ভ্রমণ করা করতো, বিশেষ করে ইস্টার্ন মিস্টিসিজমের প্রতি তার ভক্তি লক্ষ্যণীয়। সে অমলতন্ত্র রিচুয়াল(১৯১৮সালে) পালন করতো, যাতে শয়তান জ্বীনরা আমাদের জগতে প্রবেশ করে বড় ধরনের কিছু করতে পারে।

নিজ দায়িত্বে দেখুন- <http://www.boudillion.com/lam/lam.htm>

<https://m.youtube.com/watch?v=yUs0KF2QTaU>

সে পরে 'ব্যাবালন ওয়ার্কিং' নামক আরেকটি রিচুয়াল পালন করতে থাকে।

নিজ দায়িত্বে দেখুন-

<https://m.youtube.com/watch?v=q1Y3pVy8HME>

অভিশপ্ত জ্যাক পার্সন সেই অ্যালিস্টার ক্রোওলির নব্য মিস্টিসিজম থেলেমাতে দীক্ষিত হয়। "...Parsons converted to Thelema, the English occultist Aleister Crowley's new religious movement...." (উইকি)



অভিশপ্ত পার্সন তার টাইটেল রেখেছিল যা থেলেমিক মিস্টিসিজমের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এমনকি কাব্বালাহর নিউমেরোলজির সাথেও। "...Parsons also adopted the Thelemic title Frater T.O.P.A.N— with T.O.P.A.N represented in Kabbalistic numerology as 210..." (উইকি)

পার্সন মনে করতো থেলেমার যাদুর অপজ্ঞান কোয়ান্টাম ফিজিক্স দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। ".... Parsons came to believe in the reality of Thelemic magick as a force that could be explained through quantum physics...."(উইকি)

১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে, জন আর ফ্রান্সেস ব্যাক্সটার নামক দুই ভাইবোন হেলেনা পার্সন আর জ্যাক পার্সনের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা তাদেরকে হলিউডের Winona Boulevard নামক স্থানে নিয়ে যায়। উক্ত স্থানে থেলেনার একটি মন্দির ছিল সেখানে পার্সন নস্টিক ম্যাস নামক এক রিচুয়ালের সাক্ষী হয়। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, সেই অভিশপ্ত মন্দিরের পুরোহিতদের মধ্যে একজন ছিল হলিউড অভিনেতা, জন কারাডিন; এবং আরেকজন ছিল সমকামীদের অধিকার আদায়ের কর্মী হ্যারি হ্যায়।

পার্সন থেলেমিক টেক্সট দ্বারা এতোটাই প্রভাবিত হয়েছিল যে সে তার বন্ধুদের মাঝে এই অপবিদ্যা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করেছি। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো, যা না বললেই নয়, তার এই কাজে সঙ্গী হয়েছিল দুই সাইন্স ফিকশন রাইটার, জ্যাক উইলিয়ামসন ও ক্লেভ কাটমিল। এই দুজন নস্টিক ম্যাস নামক শয়তানের পূজার আনুষ্ঠানিকতায় অংশগ্রহণ করেছিল। (উইকি)

অপরদিকে, যে বিষয়টি বলা হয়নি; সাইটোলজি নামক একটি স্বতন্ত্র দ্বীনের প্রতিষ্ঠাতা, L.Ron Hubbard, তার সাথে পার্সনের অন্তরঙ্গতা ছিল। এমনকি



ক্রোওলির সাথেও। ১৯৫২ সালে এক লেকচারে অভিশপ্ত হাবার্ড ক্রোওলির প্রশংসা করে বলে, “my very good friend.”

হাবার্ড আর পার্সন Pasadena এর South Orange Grove এ একটি বাড়িতে থাকা শুরু করে। উক্ত বাড়িতে বিজ্ঞানী, বোহেমিয়ান আর্টিস্ট, লেখক ও অকাল্টিস্টগণ একসাথে থাকতো।

[বিশেষ দৃষ্টব্যঃ- বিনা কারণে শয়তানের পূজারীদের জীবনী আপনাদের অবগত করা প্রয়োজনের বাইরে। এ কারণে আমরা তার জীবনী পুরোপুরি জানানোর প্রয়োজন বোধ করছি না। ততোটুকুই জানাচ্ছি যতোটুকু আপনাদের জানানোর প্রয়োজন, যাতে সহজে আপনারা ফিতনাকে আইডেন্টিফাই করতে পারেন। আল্লাহ ভরসা]



নাসার জেট প্রপালশন ল্যাবের ফাউন্ডার, ফাদার অফ স্পেস এজ, ক্রোওলির দোস্ত, যে কিনা ক্রোওলির সাথে 'ব্যাবালন ওয়ার্কিং' এও অংশগ্রহণ করেছিল, সে দাজ্জাল নামক একজনের ইন্সপায়ারেশনে তার কাজ আরো এগিয়ে নিতে থাকে।

তার সাথে তার যোগাযোগ হয় স্বপ্নে। পার্সন সেই ব্যক্তির নাম তার বইয়ে  
লিখেছে, এমনকি উইকিপিডিয়াতেও আছে।

**"..Parsons professed to embody an entity named  
Belarion Armillus Al Dajjal, the Antichrist..."(উইকি)**

স্পেস এজের ফাদার পার্সন ও ক্রোওলির প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট সহায়তায় নাসা প্রতিষ্ঠিত  
হয়। পার্সনের রকেট প্রপালশন ল্যাবই ছিল নাসার পূর্বরূপ। পার্সন, হাববার্ড, আর  
ক্রোওলি, এই তিনজনের মাধ্যমেই জন্ম হয় নাসার। যদিও পরবর্তীতে আরো দুজন  
এই ঐতিহাসিক প্রতারকদের সাথে সংযুক্ত হয়। তারা হলো ওয়ানার ভন ব্রাউন ও  
ওয়াল্ট জিজনি।

এক সাথে অনেক তথ্য দিলাম আপনাদেরকে। আরো অনেক কিছুই দিতে  
চেয়েছিলাম। কিন্তু রেফারেন্সের অভাবে না দিতে বাধ্য হলাম। আপনারা হয়তো  
ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, যে আমাদের অন্যান্য আটিকেলের  
তুলনায় এই আটিকেলটিতে রেফারেন্স সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু আমরা যা  
এতক্ষণে বললাম তাতে যে স্বল্পসংখ্যক রেফারেন্স দিয়েছি তাতেই সত্যকে  
প্রস্ফুটিত করার জন্য যথেষ্ট।

**এখন একটু মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা করা যাক-----**

•• জুডিও-ব্যাবিলনীয়ান মিস্টিসিজম কাব্বালাহ, কিংবা হামেটিসিজম; এবং পিথাগোরিয়ান গ্লোব মতবাদ প্রতিষ্ঠার পর সারাবিশ্বে স্পেস ফ্যান্টাসি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। গ্যালিলিও, নিউটন, কোপার্নিকাস; এরা পিথাগোরিয়ান গ্লোব মতবাদের পুনর্জন্মের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে যায়, যা আজকের নিও নস্টিসিজমের ভিত্তি।

•• স্পেস এজেন্সিগুলো প্রতিষ্ঠা করার আগে টিভিতে স্পেস ফ্যান্টাসি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কারণ, আউটার স্পেসের কনসেপ্টই নিও প্যাগানিজমের উত্থান ঘটিয়েছে।

•• মানুষকে কল্পনার আধার সাগরে হাবুডুবু খাওয়ানোর জন্য শয়তান স্পেসকে আরো কঠিনভাবে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করে। শয়তান তার এই প্রতারণার জন্য পছন্দ করে পাঁচজন মানব শয়তানকে, তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-

১/ অ্যালিস্টার ক্রোওলি- শয়তানের পূজারী। এক মুশরিক। অকাল্টিস্ট, ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান, ৩৩ডিগ্রি ফ্রিমেসন। Ordo Templi Orientis এর লিডার। ল্যাম নামক শয়তানের শিষ্য।

২/ জ্যাক পার্সন- রকেট সাইন্টিস্ট, অকাল্টিস্ট, ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান। দাজ্জালের শিষ্য। Ordo Templi Orientis এর ক্যালিফোর্নিয়া ব্রাঞ্চের হেড।

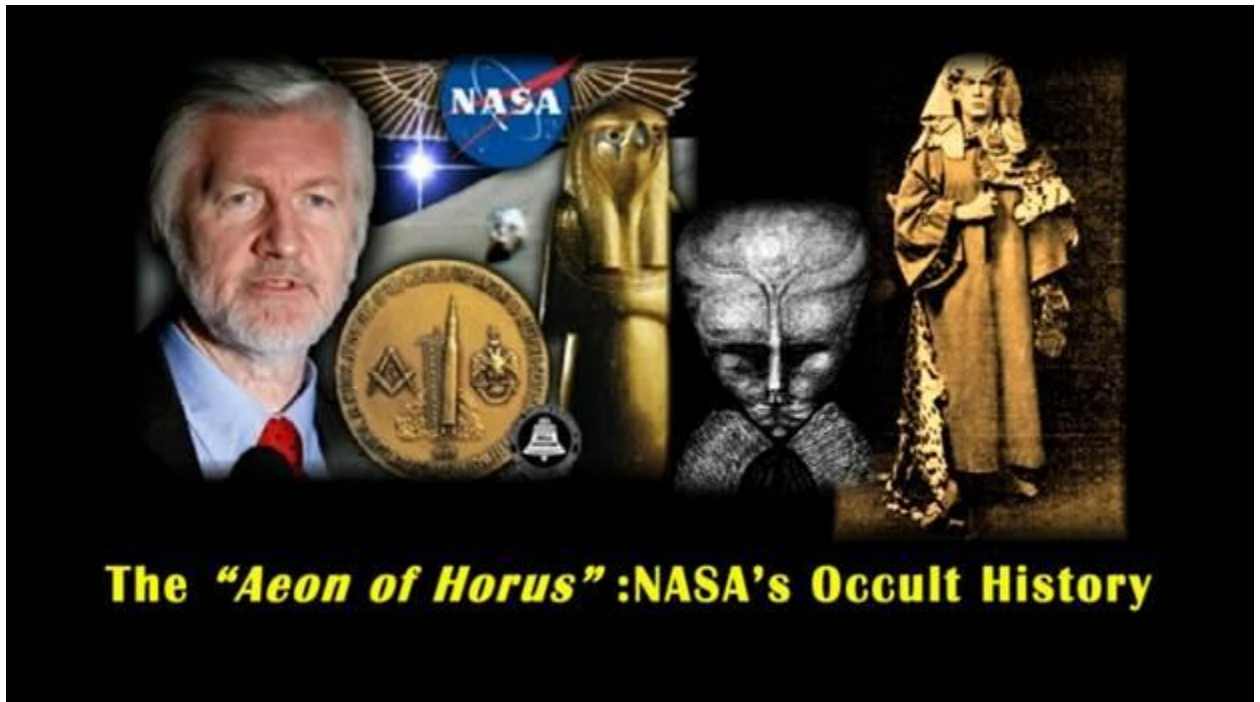
৩/ হাববার্ড- শয়তানের পূজারী, অকাল্টিস্ট, ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান, ম্যাস মাইন্ড কন্ট্রোলার। পার্সন ও ক্রোওলির বন্ধু। সাইন্টোলজি কাল্টের ফাউন্ডার।



৪/ ওয়াল্ট ডিজনি- শয়তানের পূজারী, ইলুমিনাতির সদস্য, ফ্রিমেসন, অকালিস্ট, ম্যাস মাইন্ড কন্ট্রোলার। **The Ordem DeMolay** এর ফাউন্ডার।

৫/ ওয়েনার ভন ব্রাউন- এক্স-নাযি সোলজার। জার্মান V-2 Rocket Program এর ডাইরেক্টর।

•• অভিশপ্ত পাঁচ প্রতারকদের প্রত্যক্ষ্য সহায়তায় নাসা গড়ে ওঠে।



•• এই নাসাই মুন ল্যান্ডিং ড্রামা দিয়ে সারা বিশ্বকে গিলিয়ে স্পেস ফ্যান্টাসিতে ডুবিয়ে রাখে। এই নাসাই স্পেসের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে ইন্ডাইরেক্টলি গ্যালাক্টিক এম্পায়ারের মিথ্যা স্বপ্ন দেখায়। এই নাসাই শয়তানদেরকে এলিয়েন রূপে নিয়ে

এসেছে। এমনকি এফবিআই-ও এটি স্বীকার করে যে এরিয়া ৫১তে মানুষ ও এলিয়েন একসাথে কাজ করছে।

নিজ দায়িত্বে দেখুন-

<https://m.youtube.com/watch?v=WFRwvXEXOxo>

এই নাসাই প্রজেক্ট ক্লবিমের মতো প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে।।

-

সারকথা, এই নাসা হচ্ছে নিও প্যাগানিজমের একটি প্রভাবশালী পুরোহিত।

আসলে তারা যা করে তা দাজ্জালের আগমনের স্টেজ নির্মাণ। মানুষকে কুফর ও শিরকের সাগরে হাবুডুবু খাওয়ানো, মানবজাতির এই শেষ সময়ে এসে শয়তান নাছোড়বান্দা।

নাসা স্পেসের মতো ভয়ংকর প্যাগান কনসেপ্টকে মানুষের মাঝে নর্মালাইজ করে চলেছে। বর্তমানে স্পেস সম্পর্কিত কোনো আলোচনা থাকলেই নাসার নাম

আসবেই। নাসা তার ফেক স্পেস ট্রাভেলের মাধ্যমে মানুষকে ব্রেনওয়াশ করছে।  
স্পেস স্টেশনও তার ব্যতিক্রম নয়।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমরা ওহীর মাধ্যমে যে জ্ঞান পেয়েছে উর্ধ্বাকাশ সম্পর্কিত  
ব্যাপারে, তার ওপর ভিত্তি করে বলা যায় স্পেস এজেন্সিগুলো যেরকম স্পেস  
দেখায় আসলে তা সেরকম নয়। তারা যা দেখায় তা কিছু পেইন্টিং, সিজিআই  
কিংবা অ্যানিমেশন।

নিচের হাদিসটি পড়ুন।

اَحَدُنَا يُونُسُ بْنُ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالُوا - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَغَيْرُ، وَاحِدٍ،  
نَا الْحَسَنُ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَ  
أَصْحَابُهُ إِذْ أَتَى اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَ هُرَيْرَةٌ، قَالَ بَيْنَمَا نَبِيُّ  
"تَدْرُونَ مَا هَذَا هَلْ تَ" عَلَيْهِمْ سَحَابٌ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَسْأَلُهُ اللَّهُ رَضَ هَذَا الْعَنَانُ هَذِهِ رَوَايَا الْإِ قَالَ فَقَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ  
هَلْ تَدْرُونَ مَا "مَّ قَالَ تَ " تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْكُرُونَهُ وَلَا يَدْعُونَهُ  
عُ سَقَفٌ مَحْفُوظٌ فَإِنَّهَا الرَّقِيقُ " قَالَ فَقَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ "فَوْقَكُمْ  
قَالُوا اللَّهُ " " هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ " ثُمَّ قَالَ "فَ وَمَوْجٌ مَكْفُوفٌ  
هَلْ " ثُمَّ قَالَ " " سَنَةٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةٍ " قَالَ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ  
إِنْ فَوْقَ ذَلِكَ فَ " قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالُوا "تَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ  
بَعِ سَمَوَاتٍ مَا حَتَّى عَدَّ سَدَ " سَمَاءَيْنِ وَمَا بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةٍ عَامٍ  
رُونَ مَا فَوْقَ لَ تَذْهُ " ثُمَّ قَالَ بَيْنَ كُلِّ سَمَاءَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  
لِعَرْشٍ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ فَإِنَّ فَوْقَ ذَلِكَ ا " قَالَ فَقَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ " ذَلِكَ  
" ا الَّذِي تَحْتَكُمْ هَلْ تَدْرُونَ مَ " ثُمَّ قَالَ " السَّمَاءُ بَعْدَ مَا بَيْنَ السَّمَاءَيْنِ  
هَلْ تَدْرُونَ مَا " ثُمَّ قَالَ " فَإِنَّهَا الْأَرْضُ " قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالُوا

تَحْتَهَا الْأَرْضَ فَإِنَّ "قَالَ . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . "الَّذِي تَحْتَ ذَلِكَ  
عَ أَرْضَيْنِ بَيْنَ كُلِّ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ . "ثَلَاثَةَ سِنِينَ الْأُخْرَى بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةٍ  
حَمْدٌ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّكُمْ وَالَّذِي نَفْسُ مِ "أَرْضَيْنِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةٍ سَنَةٍ ثُمَّ قَالَ  
هُوَ الْأَوَّلُ ) ثُمَّ قَرَأَ . "هَذَا دَلِيلُكُمْ رَجُلًا بِحَبْلِ إِلَى الْأَرْضِ السَّقْلَى لَهَبَطَ عَلَى اللَّهِ  
وَعِيسَى هَذَا قَالَ أَبُو . (وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  
بْنُ عَبِيدٍ قَالَ وَيُرَوَّى عَنْ أَيُّوبَ وَيُونُسَ . حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ  
فُسِّرَ بَعْضُ أَهْلِ وَ . لَمْ يَسْمَعْ الْحَسَنُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ قَالُوا  
عِلْمُ . تَهْ وَسُلْطَانِهِ الْعِلْمُ هَذَا الْحَدِيثُ فَقَالُوا إِنَّمَا هَبَطَ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ وَقَدَّرَ  
مَا وَصَفَ فِي عَرْشِ كَاللَّهِ وَقَدَّرْتُهُ وَسُلْطَانُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَهُوَ عَلَى الْ  
كِتَابِهِ .

আবু হুরাইরা (রাঃ)

তিনি বলেনঃ কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)  
ও তাঁর সাহাবীগণ এক সাথে বসা ছিলেন। হঠাৎ তাদের উপর মেঘরাশি

প্রকাশিত হল।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের প্রশ্ন করেন : তোমরা  
জান এটা কি? তারা বললেনঃ আল্লাহ তা’আলা ও তাঁর রাসূলই বেশি  
ভালো জানেন। তিনি বললেনঃ এটা হল যমিনের পানিবাহী উটা আল্লাহ  
তা’আলা একে এমন জাতির দিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন যারা তাঁর  
কৃতজ্ঞতাও আদায় করে না এবং তাঁর কাছে মুনাজাতও করে না।

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন : তোমাদের উপরে কি আছে তা জান? তাঁরা  
বললেনঃ আল্লাহ তা’আলা ও তাঁর রাসূলই বেশি ভালো জানেন। তিনি  
বলেনঃ এটা হল সুউচ্চ আকাশ , সুরক্ষিত ছাদ এবং আটকানো তরঙ্গ।

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন : তোমাদের এবং এর মাঝে কতটুকু ব্যবধান তা তোমাদের জানা আছে কি? তারা বললেন, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলই বেশি ভালো জানেন। তিনি বললেনঃ তোমাদের ও এর মাঝে পাঁচ শত বছরের পথের ব্যবধান। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন : এর উপরে কি আছে তা তোমরা জান কি? তাঁরা বললেন , আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশি ভালো জানেন।

তিনি বললেনঃ এর উপরে দুইটি আকাশ আছে যার মাঝে পাঁচ শত বছরের দূরত্ব, এমনকি তিনি সাতটি আকাশ গণনা করেন এবং বলেনঃ প্রতি দু'টি আকাশের মাঝে পার্থক্য আকাশ ও যমিনের ব্যবধানের সমপরিমাণ।

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন : এর উপরে কি আছে তা কি তোমরা জান? তাঁরা বললেন আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলই বেশি ভালো জানেন। তিনি বললেনঃ এগুলোর উপরে আছে ( আল্লাহর ) আরশা আরশ ও আকাশের মাঝের পার্থক্য দুই আকাশের মধ্যকার দূরত্বের সমান।

তিনি আবার বললেনঃ তোমরা কি জান তোমাদের নিচে কি আছে? তাঁরা বললেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশি ভালো জানেন। তিনি বললেনঃ উহা হল যমিন , তারপর আবার বললেন, তোমরা কি জান এর নিচে কি আছে? তাঁরা বললেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেনঃ এর নিচে আরো এক ধাপ যমিন আছে এবং এতদুভয়ের মধ্যে

পাঁচ শত বছরের দূরত্ব। তারপর সাত স্তর যমিন গুণে বলেনঃ প্রতি দুই স্তরের মাঝে পাঁচ শত বছরের দূরত্ব বর্তমান।

তিনি আবার বললেনঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন! তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন : “ তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ তিনিই প্রকাশ্য এবং তিনিই গুপ্ত। তিনিই সর্ববিষয়ে সর্বশেষ পরিজ্ঞাত “ ( সূরাঃ আল-হাদীদ-৩)।

-

জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ৩২৯৮।

সুতরাং আপনারা দেখাতে পাচ্ছেন বাস্তবতা সেরকম নয় যেরকমটা প্রতারক নাসা কিংবা অন্যান্য স্পেস এজেন্সিগুলো দাবী করে।

শয়তানের আবৃত্ত কাব্বালিস্টিক কসমোলজি অনুযায়ী স্পেস হলো ইনফিনিট ভ্যাকিউম। কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে সত্যটা জানিয়েছেন।

কিছু কিছু বর্ণনায় আসমান কাচের তৈরী, আবার কিছু বর্ণনায় রয়েছে আসমান বরফের তৈরী। আল্লাহই সর্বোত্তম জানেন।



আকাশ সম্পর্কে কিছু আয়াত যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আকাশ কোনো  
শূণ্যস্থান নয়, বরং তা দুর্ভেদ্য।



**Surah Al-Hajj, Verse 65:**

بِأَمْرِهِ الْبَحْرُ يَافِجٍ وَتَجْرِي وَالْفُلُكُ الْأَرْضُ فِي مَآ لَكُمْ سَخَّرَ اللَّهُ أَنْ تَرَ أَلَمْ  
رَحِيمٌ لِرَعُوفٍ بِالنَّاسِ اللَّهُ إِنَّ يَإِذْنِهِ إِلَّا الْأَرْضُ عَلَى تَقَعُ أَنْ السَّمَاءَ وَيُمْسِكُ

তুমি কি দেখ না যে, ভূপৃষ্ঠে যা আছে এবং সমুদ্রে চলমান নৌকা  
তৎসমুদয়কে আল্লাহ নিজ আদেশে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং  
তিনি আকাশ স্থির রাখেন, যাতে তাঁর আদেশ ব্যতীত ভূপৃষ্ঠে পতিত না হয়।  
নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি করুণাশীল, দয়াবান।

,

### Surah Ash-Shura, Verse 5:

رَبَّهُمْ بِحَمْدٍ حُونٍ يُسَبِّحُ الْمَلَائِكَةُ فَوْقَهُنَّ مِنْ يَتَقَطَّرْنَ السَّمَاوَاتُ تَكَادُ  
حَيْمُ الرِّ الْغُفُورُ هُوَ اللَّهُ إِنَّ أَلَا أَرْضًا فِي لِمَنْ وَيَسْتَغْفِرُونَ

আকাশ উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয় আর তখন ফেরেশতাগণ  
তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং পৃথিবীবাসীদের  
জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। শুনে রাখ, আল্লাহই ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

,

### Surah At-tur, Verse 9:

مَوْرًا السَّمَاءُ تَمُورُ يَوْمَ

সেদিন আকাশ প্রকম্পিত হবে প্রবলভাবে।

### Surah Al-Mursalat, Verse 9:

فُرَجَّتْ السَّمَاءُ وَإِذَا

যখন আকাশ ছিদ্রযুক্ত হবে,



### Surah Al-Muzzammil, Verse 18:

مَفْعُولًا وَعَدُهُ كَانَ بِهِ مُنْقَطِرُ السَّمَاءِ

সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। তার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

### Surah Al-Hajj, Verse 65:

بِأَمْرِهِ الْبَحْرُ يَفْتَخِرُ وَالْفُلُكُ الْأَرْضُ فِي مَآ لَكُمْ سَخَّرَ اللَّهُ أَنْ تَرَ أَلَمْ  
رَحِيمٌ لِرَعُوفٍ بِالنَّاسِ اللَّهُ إِنَّ يَأْذِنِهِ إِلَّا الْأَرْضُ عَلَى تَقَعُ أَنْ السَّمَاءَ وَيُمْسِكُ

তুমি কি দেখ না যে, ভূপৃষ্ঠে যা আছে এবং সমুদ্রে চলমান নৌকা  
তৎসমুদয়কে আল্লাহ নিজ আদেশে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং  
তিনি আকাশ স্থির রাখেন, যাতে তাঁর আদেশ ব্যতীত ভূপৃষ্ঠে পতিত না হয়।  
নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি করুণাশীল, দয়াবান।

### Surah An-Naba, Verse 12:

شِدَادًا سَبْعًا فَوْقَكُمْ وَبَيْنَنَا

নির্মান করেছি তোমাদের মাথার উপর মজবুত সপ্ত-আকাশ।

### Surah Fatir, Verse 41:

مِنْ أَمْسَكَهُمَا نِ زَالَتَا وَلَيْنَ تَزُولَا أَنْ وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ يُمَسِّكُ اللَّهُ إِنَّ  
عَفُورًا حَلِيمًا كَانَ إِنَّهُ بَعْدَهُ مِنْ أَحَدٍ



নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও যমীনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়। যদি এগুলো টলে যায় তবে তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে স্থির রাখবে? তিনি সহনশীল, ক্ষমাশীল।

### Surah Saba, Verse 9:

نَشَأُ إِن لِّلْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ مَن خَلَقَهُمْ وَمَا أَيْدِيهِمْ نَبِيٍّ مَا إِلَىٰ يَرَوْا أَقْلَمَ  
لَّكُلِّ لَآيَةٍ ذَٰلِكَ فِي إِنْ السَّمَاءِ مَن كَسَفًا عَلَيْهِمْ نُسْقِطُ أَوْ الْأَرْضِ بِهِمْ نُخَسِفُ  
مُنِيبٍ عَبْدٍ

তারা কি তাদের সামনের ও পশ্চাতের আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিলক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে তাদের সহ ভূমি ধসিয়ে দেব অথবা আকাশের কোন খন্ড তাদের উপর পতিত করব। আল্লাহ অভিযুক্ত প্রত্যেক বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

অনেকের অ্যাপোলজিটিক দাঁড়িয়ে মতে কুরআনে আকাশ বলতে মহাশূণ্যের সবকিছুকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন ভ্যাকিউম থেকে শুরু করে টেরাফার্মা, স্টার ও অ্যাস্টেরয়েডও। কিন্তু তাদের এই অপব্যখ্যা সুরা ফাতিরের ৪১নং আয়াত দ্বারা ভুল প্রমাণিত হয়। কেননা হেলিওসেন্ট্রিক কসমোলজিতে অ্যাবসোলুট স্থির বলতে এই ইউনিভার্সে কিছুই নেই। সুতরাং আয়াতটিতে স্থির রাখা দুর্ভেদ্য আসমানকেই বুঝানো হয়েছে।

বর্তমানে কিছু মানুষ যেন নাসার মতো শয়তানি সংগঠনকে নিজেদের রব হিসেবে নিয়েছে, তারা যেন নাসার পূজা করে। নাসা যদি বলে পৃথিবী গোল, তারাও তার গলায় সুরে সুর মিলিয়ে তা মেনে নেয়। এমনকি সাইন্টিজমের ওপর ভিত্তি করে কিছু অ্যাপোলজিটিক দাঁড়ি বিগ ব্যাং(কসমিক এগ) এর মতো অকাল্ট মতবাদকে কুরআন দিয়ে প্রমাণ করতে যাওয়ার দুঃসাহস দেখায়, তারা নাসার কথা বিশ্বাস করে প্রচার করে বেড়ায় জমীন গোল, এমনকি কুরআনের সাথে কম্প্যাটিবল প্রমাণ করতে চায় আল্লাহও নাকি জমীনকে গোল বলেছেন! নাউজুবিল্লাহ!

ধরে নিলাম আপনারা জানেন না যে নাসা একটা শয়তানের সাহায্যকারী সংগঠন। কিন্তু আপনারা কি কুরআন পড়েন না?

**"হে মু'মিনগণ! কোনো ফাসিক যদি তোমাদের কাছে কোনো খবর নিয়ে আসে, তাহলে তার সত্যতা যাচাই করে লও..." (সুরা হুজুরাত,৬)**



ফাসিকের ব্যাপারেই এই বিধান, তাহলে পিথাগোরাস, গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস, নিউটন, আইনস্টাইন, হাবল, মিচিও কাকু এদের মতো নিকৃষ্ট কাফিরদের থিওরীর ব্যাপারে কী হবে?





যেখানে সুস্পষ্টভাবে অকাট্য সব দলীলাদী বিদ্যমান, যেগুলো এ কথাই তুলে ধরে যে পৃথিবী সমতল বিস্তৃত, সেখানে জোর করে কুরআন হাদিসের সাথে কম্প্যাটিবল প্রমাণ করতে যাওয়াটা কতো বড় জঘন্য ধৃষ্টতা! কতো বড় মুর্থতা! কতো বড় পরাজিত মনমানসিকতা! আল্লাহ আমাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা করুন! আমিন ইয়া রব্বাল আলামীন!



মনে রাখবেন, শয়তান শেষ জামানায় দাজ্জালের জন্য আশ্রিকে তার ঘাটি হিসেবে নিয়েছে। গণতন্ত্র থেকে স্পেস ফ্যান্টাসি, এমন কোনো কুফর নেই যাতে আশ্রিকার সম্পৃক্ততা অস্বীকারযোগ্য। নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার, নিউ এজ মুভমেন্ট, নিউ এজ প্যাগানিজম- একাধারে যতো শয়তানি, সবার মাথা হলো আশ্রিকা।

এই আশ্রিকা হলো সিক্রেট সোসাইটিগুলোর নস্টিক এম্পায়ার, ফিলোসফিক্যাল এম্পায়ার, নব্য গণতান্ত্রিক আটলান্টিস। তাহলে স্পেসই বা বাদ থাকবে কেন?

**বিজ্ঞান হলো বিশাল মিথ্যার একটি ইকোসিস্টেম।**

এই ইকোসিস্টেমে প্রত্যেক মিথ্যা অপর মিথ্যার ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক মিথ্যা অপর মিথ্যাকে জাস্টিফাই করে।

ধরুন পিথাগোরাসের গ্লোব আর্থকে ডিফেন্ড করার জন্য নিউটন গ্রাভিটি আবিষ্কার করলো। এখন গ্রাভিটি থাকলে মহাবিশ্বের সবকিছু একটি বিন্দুতে চলে আসার কথা। কিন্তু তা হচ্ছে না। অতএব একে বাচানোর জন্য আরেকটি মিথ্যা নিয়ে আসলো। আউটার স্পেস। স্পেসে প্রচুর খালি জায়গা, এতাই খালি যে দূরত্বের একক হলো লাইট ইয়ার। তারপরেও পূর্বের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। অতএব নতুন মিথ্যা হিসেবে আবিষ্কার হলো ডার্ক এনার্জি। এইভাবে একটি বিশাল ইকোসিস্টেম প্রস্তুত হয়ে যায়।

বিজ্ঞানাক্ষ কোনো মুসলিম ভাইকে বুঝাতে গেলে তাদের এই করুণাবস্থা আরো ক্লিয়ার হয়ে ধরা দেয়া পৃথিবী গোলা কেন? প্রমাণ কী? উত্তর আসলো গ্রাভিটি। এ ব্যাপারটা আপনাদেরকে বুঝতে হবে।

আল্লাহ বলেন, “আর যখন বলা হয়, ‘আল্লাহর ওয়াদা সত্য, আর কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই’। তখন তোমরা বলে থাক, ‘আমরা জানি না কিয়ামত কী? আমরা কেবল অনুমান করি এবং আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী নই’” (সূরা জাসিয়া, ৩২)।

এই ব্যাপারটা অনেকটা এইরকম “আমরা আমাদের জ্ঞানে তো কিয়ামত কি জিনিস পাই না। আমরা হাইপোথিসিস ও থিওরী দিই।”

ব্যাবিলন ও মিশর থেকেই তাদের এই ধারা চলে আসছে।



বিজ্ঞানান্ধদের আরেকটি হাস্যকর ব্যাপার হলো তাদের ক্রিটিক্যাল থিংকিং করার অক্ষমতা। তাদের ধারণা সমতল জমীনে সূর্যের চলাচল, ঋতুপরিবর্তন, দিন-রাত্রির সঠিক ব্যাখ্যা আমাদের নিকটে থাকতে হবে, না থাকলে সমতল জমীন মিথ্যা। আচ্ছা বলুন তো পিথাগোরাস যখন জমীনকে গোল বললো তখন কি তার কাছে দিন-রাত্রির মডেল ছিল? তারপরেও কেন সে জমীনকে গোল বলেই গেলো? কারণ জাহাজের হরাইজনে ধীরে ধীরে যাওয়াকে সে গোল জমীনের অকাট্য ও বাস্তব প্রমাণ মনে করেছে। সে পরিস্থিতিতে গ্লোব আর্য একটি “ফ্যাক্ট”। এখন এই “ফ্যাক্ট” এর ভিত্তিতে ধীরে ধীরে দিন-রাত্রি ও অন্যান্য ব্যাপারগুলোর মডেল আনতে হবে। তাছাড়া তখন গ্রাভিটি আবিষ্কৃত হয়নি। এতে প্রশ্ন এসে যায় গ্লোবে সমুদ্রের পানি লেগে থাকে কিভাবে? এতো প্রশ্ন সত্ত্বেও সে গ্লোব মতবাদকেই আঁকড়ে ধরেছিল, কারণ আপাত ফ্যাক্টের বিরুদ্ধে হাইপোথেটিক্যাল কোয়েশানের কোনো মূল্য নেই।



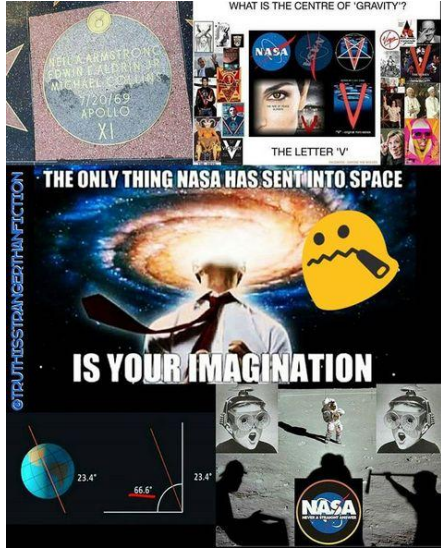
ফ্ল্যাট আর্থের বিরুদ্ধে “দিন-রাত হয় কেন”, “স্পেস স্টেশন আকাশে কেনে ওড়ে”, “উল্কাপাত কেনে হয়”, “সমতল জমীনের প্রাপ্ত কই”, “পানি পড়ে যায় না কেন”, “নাসার ছবিগুলো কি মিথ্যা”, “এতো এতো অংক করি সেগুলো কি মিথ্যা” প্রভৃতি মূর্খতাপ্রসূত প্রশ্ন করবার আগে যেন এই উসূল মাথায় থাকে। সবকিছু উত্তর সঙ্গে সঙ্গে আসে না, আর আমরা বিজ্ঞানীদের মতো সাইকাদেলিক ড্রাগ খেয়ে ইমাজিনারি কোনো চমৎকার থিওরীও দিই না যা বর্তমান অবস্থানকে জাস্টিফাই করে। ফ্ল্যাট আর্থ একটি ফ্যাক্ট, এ সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যাখ্যা গবেষণালব্ধ জ্ঞান, যা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে।

“অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। তারা তো কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে। আর নিশ্চয় অনুমান সত্যের মোকাবেলায় কোনই কাজে আসে না।” (সুরা নাজম, ২৮)

### **বিজ্ঞান প্রেমীরা বিজ্ঞানমনস্ক নয়, বরং বিজ্ঞানান্ধ :**

একজন বিজ্ঞানমনস্ক হিসেবে আমি কিন্তু কখনো বিজ্ঞানীদের কাছে দাবি করিনি, স্যার আপনার পরীক্ষাটা আমি নিজে না-করে বিশ্বাস করব না। আপনার পর্যবেক্ষণটা আমি নিজে করে ও দেখে প্রমাণ পেতে চাই। গবেষকের মতো এরকম কোনো কথা বলে আমি মানুষের হাসির পাত্র হইনি।





তারা বলেছেন মঙ্গল গ্রহ লালচে, আমি বিশ্বাস করে নিয়েছি। তারা বলেছেন, শনির চারপাশে বলয় আছে, আমি বিশ্বাস করে নিয়েছি। তারা হিসেব করে দেখেছে সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে এত সেকেন্ড সময় লাগে, আমি জ্বি হজুর করেছি। পূর্ণ ইয়াকিনের সাথে আমি তাদের কথার উপর ঈমান এনেছি। তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, কাজের ধরন-পদ্ধতির উপর আমার আস্থা আছে। তারা এই বিষয়ের একজন পুরোধা।

কোনো দার্শনিক চিন্তা, কোনো যুক্তি খাটাইনি। যদিও খালি চোখে দেখছি চন্দ্র-সূর্য দুটোই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে, কিন্তু বিজ্ঞানীরা যেহেতু বলেছেন পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে ঘোরে, আমি দ্বিমত করিনি। আমি বলিনি, স্যার আমাকে একটু নভোযানে করে উপরে নিয়ে গিয়ে দেখান তো। আমি চর্মচক্ষু দিয়ে দেখতে চাই।

বিজ্ঞানী বলতে আমি অন্ধ।

কাল ওরা যদি বলে, টেলিস্কোপ দিয়ে ওরা মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে নতুন গ্রহের সন্ধান পেয়েছে, তাতে আমার চোখ কপালে উঠবে না।

পরশুদিন যদি বলে, বুধ গ্রহ সূর্যের প্রখর তাপ সহিতে না-পেরে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাচ্ছে, আমার মুখ হা হবে না। বলব না, বলে কী! পাগল নাকি! গাঁজা খেয়ে বিজ্ঞানী

হয়েছে নাকি? বলব না, এলিয়েনরা তাকে এই খবর দিয়েছে নাকি? আমি তাদের বিশ্বাস করি। নিজের চোখের চেয়ে তাদের দক্ষতায় আমি বেশি আস্থ্য রাখি।

RM: এতক্ষন আপনারা একজন বিজ্ঞান প্রেমীর (অন্ধ) আত্মকথাগুলো পড়লেন। যদিও এটা কাল্পনিক, কিন্তু ব্যাপারটা এমনি। তারা কখনোই বিজ্ঞান (?) বা বিজ্ঞানীদের (?) ব্যাপারে প্রশ্ন করেনা। সব আবিষ্কার ও মতবাদ গুলোকে বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়া বিজ্ঞানের নাম দিয়ে অপবিজ্ঞানীরা (মূলত জাদুকর) যা বুঝায়, তাই বুঝে। ঠিক হাতি আর অন্ধ ব্যক্তির মতো।

অন্যদিকে, তাদের সমস্ত প্রশ্ন, সন্দেহ ও সংশয় শুধুমাত্র ইসলামের ব্যাপারে। ইসলামের কোনো কিছুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না পেলে তারা সেটা মেনে নিতে পারেনা। আর এছাড়াও ইসলামের ব্যাপারে তাদের আক্রমণাত্মক প্রশ্নের শেষ নেই।

কিন্তু মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হলো সম্পূর্ণ এর বিপরীতে অবস্থান করা। অর্থাৎ বিজ্ঞানকে প্রশ্ন ছুড়ে দেয়া। সত্যতা যাচাই ছাড়া বিজ্ঞানের কোনো মতবাদকে মেনে না নেয়া। কোরান, হাদিস ও বাস্তবতার সাথে মিলছে কিনা তা খতিয়ে দেখা। আর ইসলামের সমস্ত হুকুম আহকামকে (শুনলাম ও মানলাম নীতিতে) বিনা যুক্তিতে মেনে নেয়া।

**অপবিজ্ঞান দিয়ে কখনোই মুসলিমদের উন্নয়ন সম্ভব নয়:**

**এ জাতি যদি বৃদ্ধিত জ্ঞান কি জিনিস?**

আসসালামু আলাইকুম। আজকের বেশির ভাগ আলেম, সাধারণ মানুষ বিজ্ঞান

বিজ্ঞান করে অপবিজ্ঞানে অজ্ঞান। উচ্চ মাপের ইংলিশ স্কলাররা তাই মনে করেন

কারণ তাদের ব্যকগ্রাউন্ড অপবিজ্ঞান। সাধারণ কওমি আলেমগন হীনমন্যতা ভুগতে

দেখি বিজ্ঞান নামক অপবিজ্ঞান না জানার কারনে। ওয়াল্লহি সেকুলার ব্যবস্থায় যত পড়লেখা করেছি, এই পর্যন্ত, এসে মনে হচ্ছে পবিত্র ফুরকান হাদিস ব্যতীত যত পড়া আছে তা অপ্রয়োজনীয়। হ্যাঁ ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তার এগুলো হচ্ছে কারিগরি জ্ঞান যা পেশা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এগুলো জ্ঞানের মাপকাঠি নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক, মুসলিম জাতি এগুলো জ্ঞানের মাপকাঠি হিসেবে মানে। তারা মনে করে পাশ্চাত্যে সাথে এগুলো তে পিছিয়ে যাওয়ার কারণে মুসলিমদের অধপতন, সত্যি বলতে কাফেরদের শেখানো হীনমতবাদে তারা বিশ্বাসী প্রকৃতি পক্ষে মুসলিমরা ইসলাম থেকে দূরে সরে যেয়ে দুনিয়ায় প্রতি আসক্তি কারণে অধপতন। শিল্প বিপ্লব, কুফরি বিজ্ঞান পৃথিবীকে ধংসের দারপ্রান্তে এনেছে যা এখন আধুনিক সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত। যদি এগুলো মুসলিম দের উন্নয়ন এর মাপকাঠি হতো তাহলে ন্যাটোর মত শক্তিশালী শয়তানদের হারিয়ে চাষা তালিবানরা বিজয় লাভ করতে পারতেন। আমাদের ইংলিশ স্কলাররা এখনো ভুলের মধ্যে আছে কুফরি শাস্ত্র নিয়ে। ইয়াসির কাদির তার মধ্যে একজন তার অনেক লেকচার ভালো লাগে কিন্তু এই ফিচার টার সাথে একমত হতে পারলাম না। মুদ্রন যন্ত্র দরকার ছিলো ইসলামিক মতবাদ প্রসারের জন্য কিন্তু চীনা গ্রীক এর মত কুফরি শাস্ত্র নয়। নিউটন গ্যালিলিও এদের কে নায়কের আসনে বসিয়ে ফেলেছে ওরা ছিল শয়তান এর পুজারি। ঠিক কিয়ামত এর আগে ইলম উঠে যাবে

অভিভাবকরা ছেলে মেয়েদের হাফেজ বানাতে চায়, আবার নাসার বিজ্ঞানি বানাতে চায়। হায়রে এ জাতি যদি বুদ্ধিত জ্ঞান কি জিনিস। সেকুলার ব্যবস্থায় সব অপ পড়াশোনা। বাংলাদেশের স্কুলের বইগুলো আমি খেয়াল করেছি, বাংলালী ভ্রষ্ট সংস্কৃতি & অপবিজ্ঞান, হায়রে জ্ঞান এগুলো শিখে তারা কি আদর্শ মুসলিম হবে? যেমনটা সাহাবায়ে কেরামগণ ছিলেন?

### মুসলিমদের পতন দুনিয়াবী আসবাব কে পরিত্যাগ করার কারনে নয়।

সিরিয়ায় বা শামে মোংগলদের আক্রমণের আগে ভোগ বিলাস এমন পর্যায়ে গিয়েছিলো যে ইতিহাস সাক্ষী, মুসলমানদের বিয়েতে এত খরচ এতো, যেটা এখনকার সেলিব্রেটিরাও এত খরচ করে না।

কিন্তু ইমানী হালতের অবস্থা ছিলো তথৈবচ, পুরোপুরি ভোগবিলাসী মত্ত ছিলো। অর্থ ছিলো, অস্ত্র ছিলো কিন্তু সেটা মোংগলদের মোকাবিলা করতে পারে নি, আর মোংগলরা বাগদাদ যেটা ছিলো তৎকালীন খিলাফতের রাজধানী এমন সময় আক্রমণ করেছিলো যখন, নগরীর সুরক্ষা গেটের বাহিরে গিয়ে যে, মুসলিম সেনাবাহিনী আক্রমণ করবে সে অবস্থায় ছিলো না, কারণ সৈন্য থেকে সেনাপ্রধান সব ছিলো দুনিয়ার ভালোবাসায় মগ্ন, বাগদাদ ছিলো সেই সময়কার উন্নত শহরের মধ্যে অন্যতম ছিলো।

যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, মুসলিমের জাগতিক পতন সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে, যেদিন থেকে মুসলিমরা কুরআন এবং আল্লাহর রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সুনত কে ছেড়ে দিয়েছিলো।

সচেতন মুসলিম হিসেবে অব্যশই আমাদের জ্ঞান নিতে হবে এমন কোন কারো কাছ থেকে যারা শরীয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম কে ব্যাখ্যা করে.

আর সেকুলার বা পশ্চিমা স্কলারদের থেকে জ্ঞান নেবার আগে ভেবে দেখা উচিত, তারা এমন সোসাইটি তে বসবাস করে যেখানে ইসলাম কে compromise করেই চলতে হয়।

**R:M:** আমাদের কথা গুলো ভালো করে বুঝার চেষ্টা করুন। আমরা ঢালাও ভাবে সমস্ত আবিষ্কারকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করছি না। আমরা শুধুমাত্র অপবিজ্ঞান ও প্রচলিত স্যাটানিক কুশিক্ষাকেই দূরে সরিয়ে দিতে চাচ্ছি। আমাদেরকে পরিপূর্ণ রূপে কুরআন, হাদিস ও তাকওয়ার উপর আসতে হবে। এরপর আমাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় আবিষ্কার করতে হবে। কুরআন হাদিসে পৃথিবীর সমস্ত তথ্য দেয়া আছে। আমরা ভালো করে গবেষণা করিনি বলে আজ কাফেরদের কাছে হাত পাততে হয়। আপনি কয়েকটা তাফসীর কিনে পড়ুন। সব তথ্য পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। কিন্তু এক্ষেত্রে আপনার অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করতে হবে। মগজ থেকে বিজ্ঞানের ভুত বের করে দিতে হবে। নয়তো যখন দেখবেন বিজ্ঞানের সাথে মিলছে না, তখনি আপনি সংশয়ে পরে যাবেন। আপনাকে প্রকৃত মুমিন হতে হবে। এই ধারণা নিয়ে পড়া শুরু করুন, বিজ্ঞানের সাথে মিলুক বা না মিলুক, আমার আল্লাহ যা বলেছেন সেটাই সত্য। বিজ্ঞানই ভুল। বিজ্ঞান বরং সে পর্যন্ত এখনো পৌঁছাতে পারে নি। যারা বিজ্ঞানের সাথে কুরআনকে মিলানোর জন্য ছুটাছুটি করে তারাই একসময় সংশয়বাদী হয়ে যায়। আর যাদের ভাগ্য খারাপ তারা হয়ে যায় নাস্তিক।

সুতরাং, কুরআনকে কুরআন দিয়েই বুঝার চেষ্টা করুন। অপবিজ্ঞান দিয়ে নয়। আল্লাহ আমাদেরকে দাজ্জালের জ্ঞানের ফেতনা (অপবিজ্ঞান ও কুশিক্ষা) থেকে হেফাজত করুন, আমিন।

### **কাফেরদের মিথ্যা থিওরীগুলোকে কুরআন দিয়ে সত্যায়ন?**

কাফেররা একের পর এক নতুন নতুন কাল্পনিক মতবাদ ( বিগ ব্যাং, বিগ ক্রাঞ্চ, বিবর্তনবাদ ইত্যাদি ইত্যাদি) বের করেছে, আর একদল মুসলিম সেগুলোকে কুরআন ও হাদিস দ্বারা ইসলামাইজড বা সত্যায়ন করে যাচ্ছে। হে অপবিজ্ঞানপন্থী অত্যাধুনিক মডারেট মুসলিম ভাই, ভালো করে ভেবে দেখুন এসব কাজের দ্বারা আপনি ইসলামকে প্রমোট করছেন না। বরং আপনি নিজের অজান্তে কাফেরদের মিথ্যা তত্ত্ব গুলোকে প্রমোট ও হাইলাইট তো করছেনই, উপরন্তু কুরআন দিয়ে সত্যায়নের অপচেষ্টাও করছেন। নাউযুবিল্লাহ।

কাফেররা মিথ্যা, কাল্পনিক ও আজগুবি সব থিওরি প্রচার করে আর আপনি প্রতিনিয়ত সেগুলোকে কোরানের অপব্যাখ্যা দিয়ে সত্যায়ন করে দিচ্ছেন?? বাহ্। বাহ্। বিনা পারিশ্রমিকে আপনি কাফেরদের জন্য কাজ করে দিচ্ছেন?? কখনো কি কাফেরদের এসব কল্পকাহিনীকে প্রশ্ন করার চিন্তা টুকুও মাথায় আসেনা?

ভালো করে শুনে রাখুন, আপনাদের এসব কর্মকাণ্ড অর্থাৎ অপবিজ্ঞানকে ইসলামাইজড করার কারণে মোটেও ইসলামের কোনো উপকার হচ্ছেনা,

বরং কাফেররাই লাভবান হচ্ছে। আর এর দ্বারা উল্টো নাস্তিকদের কাছে ইসলাম অপমানিত হচ্ছে। ওরা আরো বেশি ট্রল করার সুযোগ পাচ্ছে। ইসলামে যেটা যেভাবে বলা আছে সেটা সেভাবেই তুলে ধরুন। বিজ্ঞানের সাথে মিলছেন বলে, প্রচার করতে ভয় না পেয়ে সাহসের সাথে সত্যকে প্রচার করুন।

আফসোস, উম্মাহ আজ কতটা ব্রেইনলেস হয়ে গেছে।

আল্লাহ প্রদত্ত মগজটাকে কাফেরদের অংকের বেড়াজাল থেকে বের করতেই পারেনা। নিজেই নিজেকে মানসিক দাসে পরিণত করে রেখেছে। অল্প কিছু মুমিন ভাই বার বার আওয়াজ দিচ্ছে, তার পরেও এদের সম্বিং ফিরে আসছেন। এতটাই অনুভূতিহীন হয়ে গেছে এরা। দাজ্জালি জান্নাতকে পাওয়ার জন্য এদের কতটা চেষ্টা। বুঝতেই চাচ্ছেনা যে, এই অপবিজ্ঞানই হলো দাজ্জালের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। এই অপবিজ্ঞান ও অপপ্রযুক্তি (সাথে থাকবে জীন ও জাদু) দিয়েই দাজ্জাল সূর্যকে আটকিয়ে দিবে। যেহেতু সূর্য পৃথিবীর চেয়ে ছোট। সুতরাং দাজ্জালের জন্য এটা কোনো (আল্লাহর ইচ্ছায়) ব্যাপারই না।

অতএব, দাজ্জালের সকল ফেৎনাকে বুঝতে হলে আপনাকে অবশ্যই অপবিজ্ঞান, ছদ্মবিজ্ঞান ও কোরআনিক কসমোলোজিকে (সমতলে বিছানো পৃথিবী) বুঝতে হবে।

নয়তো দাজ্জাল আপনাকে পথভ্রষ্ট করেই ছাড়বে। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন।

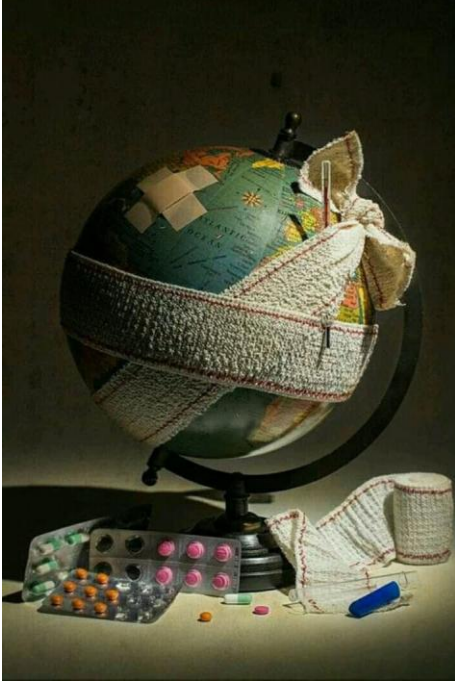
### **অপবিজ্ঞানের থিওরির অপেক্ষায় না থেকে নিজে কুরআন গবেষণা করুন:**

কিছু মানুষ (কথিত ইসলামী স্কলাররা), নিজেরা কুরআন হাদিস থেকে গবেষণা করে কোনো তথ্য বের না করে বরং অপেক্ষায় থাকে যে, কখন অপবিজ্ঞানীরা একটা থিওরি প্রসব করবে, আর সেটাকে তারা ইসলামাইজড করে প্রচার করবে। কখনো সেটার সত্যতা তো যাচাই করবেই না। উল্টো আয়াত ও হাদিস গুলোকে টেনে হিচড়ে বিকৃত করে অপবিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করবে। আর এসির নিচে বসে বৈজ্ঞানিক ইসলামের লেকচার দিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলবে।

তারা প্রকৃত ইসলামকে জনগণের সামনে তুলে ধরতে ভয় পায়, লজ্জা পায়। কারণ এমন অনেক কিছুই তো আছে যা বৈজ্ঞানিক (?) ভাবে প্রমাণিত নয়। সেগুলো বললে তো মানুষ ইসলামকে অবৈজ্ঞানিক ভাববে। তাদের মানসিকতা তো এমনি।

কিন্তু এখন সময় হয়েছে বৈজ্ঞানিক কল্প কাহিনীগুলোকে প্রশ্ন বিদ্ধ করার।





নিত্য নতুন প্রতিবেদন গুলোকে সত্যতা যাচাই ছাড়া গ্রহণ বা বিশ্বাস করাটা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। প্রশ্ন করা শিখুন, ছদ্ম বিজ্ঞানের বেড়াজাল থেকে বের হয়ে, আল্লাহর সৃষ্টিকে নিয়ে মুক্ত ভাবে অন্তর দিয়ে অনুধাবন করতে শিখুন। ওদের বেঁধে দেয়া ছক (ছোটবেলায় পাঠ্য পুস্তকে যা পড়েছেন) থেকে বের হয়ে আসুন। ১৪০০ বছর আগের প্রকৃত ইসলামকে চিনুন। একবিংশ শতাব্দীর অত্যাধুনিক, মডারেট ও অপবৈজ্ঞানিক ইসলাম থেকে দূরে থাকুন।

**বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা গুলো, মানুষকে সুবহানআল্লাহ বলতে বাধা দিচ্ছে:**

আল্লাহর কোনো সৃষ্টিকে (নতুন ও আশ্চর্য্য) দেখে, সর্বপ্রথমেই আমাদের বলা উচিত:  
“সুবহানআল্লাহ”।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই সৃষ্টিটিকে দেখে অন্তরকে আল্লাহর দিকে নিয়ে, আল্লাহর বড়ত্বের কথা চিন্তা করাই হচ্ছে মুমিনের প্রধান কাজ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক (যৌক্তিক বা অযৌক্তিক) ব্যাখ্যাগুলো আমাদেরকে তা থেকে বিরত রাখে। বেশিরভাগ মানুষই এগুলোর পিছনে বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহর কুদরত হিসেবে মেনে নিতে চায়না। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না পাওয়া পর্যন্ত অনেকেরই মন মানতে চায়না।

নিচের ছবিগুলো দেখুন। বিভিন্ন জায়গায় পানিতে এরকম আলোর সৃষ্টি হয়।



নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর কুদরত। আমরা বলবো সুবহানাল্লাহ। আমাদের রবের সৃষ্টি কত সুন্দর। কিন্তু দেখুন বিজ্ঞান ঠিকই এর একটা ব্যাখ্যা (পানিতে থাকা একপ্রকার বিশেষ ব্যাকটেরিয়ার কারণে এমনটা হয়) দাঁড় করিয়ে রেখেছে। যাতে আপনি সুবহানআল্লাহ বলতে না পারেন।

শুধু এই ক্ষেত্রে নয়, আজকের বিজ্ঞান প্রত্যেকটা জিনিসেরই এরকম কোনো না কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে রেখেছে। ফলে মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি গুলোকে দেখে আল্লাহর কথা স্মরণের বদলে বিজ্ঞানের প্রশংসা করে, নাউযুবিল্লাহ।

আমি এ কথা বলছি না যে , কোনো ব্যাখ্যা জানার চেষ্টা করা যাবেনা। বলছি,  
সবকিছুতেই ব্যাখ্যা খুঁজা ঠিক নয়। কিছু কিছু জিনিস বিনা ব্যাখ্যায় মেনে নেয়ার নাম  
ঈমান। এতে অন্তর আল্লাহর দিয়ে রুজু থাকে।

### নাসা ও অপবিজ্ঞানের প্রতি এই অন্ধ ভক্তি কবে দূর হবে?

উম্মাহ মানসিক ভাবে আজ এতটাই পরাজিত হয়ে গেছে যে , বিজ্ঞানের ঐকে দেয়া  
ছকের বাহিরে এক পাও এগোতে পারেনা। স্বাধীন ভাবে চিন্তা করার সাহস টুকুও  
হারিয়ে ফেলেছে। মাথা নিচু করে শুধু অন্ধই করে, ওই মাথাটাকে উঁচু করে কখনো  
আকাশের দিকে তাকায়না। তাকালেও নতুন করে কিছু ভাবেনা। নাসার দেয়া কল্প  
কাহিনীর বিপরীতে কোনো প্রশ্নও করে না। কোনোদিন মাথায় একটা প্রশ্ন আসে না।  
আফসোস, কাফেররা আজ আমাদের যুব সমাজকে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বানিয়ে ফেলেছে।



হে যুবক, জেগে উঠো। এমন মানসিক দাস হয়ে আর কত কাল থাকবে? এখন সময় হয়েছে ঘুরে দাঁড়াবার। কোরআনে যা আছে সেটাই সরাসরি তুলে ধরো। নাস্তিকরা, অবৈজ্ঞানিক বলবে এই ভয় তোমার অন্তর থেকে ঝেড়ে ফেলো। আল্লাহ যেভাবে বলেছেন, সেভাবেই তুমিও বল। নাসা আর বিজ্ঞান এসে তোমার পায়ে চুম্বন করবে। কুরআনকে, নাস্তিকদের কাছে বৈজ্ঞানিক বানানোর জন্য আয়াত গুলোর অপব্যখ্যা করো না। সত্যকে তুলে ধরো। এই দ্বীন পরিপূর্ণ। এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। কারো ধার ধারে না। কারো পরোয়া করে না। এই দ্বীন, তার নিজস্ব দুর্বীর গতিতে এগিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

### **নাসা প্রেমী ভাইয়েরা কাফেরদের কাছে সম্মানিত হতে চায়:**

পৃথিবীকে সমতলে বিছানো বললে নাকি কাফেররা হাসাহাসি করে। সেই ভয়ে বিজ্ঞান ও নাসা প্রেমী ভাইয়েরা অপবিজ্ঞানের সাথে তাল মিলিয়ে পৃথিবীকে বলাকার বলে কাফেরদের কাছে সম্মানিত হতে চায়।

এই ভাইয়েরা কাফেরদেরকে এটা কিভাবে বিশ্বাস করাবে যে, ঘুমের আগে আয়াতুল কুরসী পড়লে একজন ফেরেশতা এসে ওই পাঠকারীকে সারা রাত পাহারা দেয়।

আবার সূরা মূলক এসে কবরে পাহারা দিবে। এরকম অসংখ্য বিষয় আছে, যেগুলো বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। বরং কাফেররা এগুলো শুনলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়বে। এখন কি এই ভয়ে আপনি এগুলোর অপব্যাখ্যা করা শুরু করবেন?

আরে ভাই, কাফেরদের কাছে তো পুরো ইসলামটাই হাসির জিনিস। আপনি ওদের হাসির ভয়ে ইসলামকে কেন বিকৃত (বিজ্ঞানাইজড) করবেন?

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘কবরস্থিত ব্যক্তির নিকট পায়ের দিকে দিয়ে ফেরেশতারা শান্তির জন্য আসতে চাইবে। তখন তার পদদ্বয় বলবে, আমার দিক দিয়ে আসার রাস্তা নেই। কেননা সে সূরা আল ‘মূলক’ পাঠ করত। তখন তার সীনা অথবা পেটের দিক দিয়ে আসতে চাইবে। তখন সীনা অথবা পেট বলবে, আমার দিকে দিয়ে আসার কোনো রাস্তা তোমাদের জন্য নেই।

কেননা সে আমার মধ্যে সূরা আল ‘মূলক’ ভালোভাবে ধারণ করে রেখেছিল।

অতঃপর তার মাথার দিক দিয়ে আসার চেষ্টা করবে। মাথা বলবে এ দিক দিয়ে

আসার রাস্তা নেই। কেননা সে আমার দ্বারা সূরা আল ‘মূলক’ পাঠ করেছিল। সূরা

মূলক হচ্ছে বাধাদানকারী। কবরের আজাব থেকে বাধা দেবে। তাওরাতেও সূরা

আল 'মূলক' ছিল। যে ব্যক্তি উহা রাতে পাঠ করে, সে অধিক ও পবিত্র-উৎকৃষ্ট আমল করবে।' (হাদিছটি বর্ণনা করেছেন হাকেম, তিনি বলেন, এর সনদ সহিহ)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক ফরয ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আর কোন বাধা থাকে না মৃত্যু ব্যতীত' (নাসাঈ)। শয়নকালে পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার হেফাযতের জন্য একজন ফেরেশতা পাহারায় নিযুক্ত থাকে। যাতে শয়তান তার নিকটবর্তী হ'তে না পারে' (বুখারী)। [ নাসাঈ কুবরা হা/৯৯২৮, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭২; মিশকাত হা/৯৭৪, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-১৮; মুসলিম, বুখারী, মিশকাত হা/২১২২-২৩ 'কুরআনের ফাযায়েল' অধ্যায়-৮ ]

### **নাভিকদের কাছে নিজেও অপমানিত হচ্ছেন, ইসলামকেও অপমানিত করছেন:**

যখনি নাসা বা অন্য কোনো বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান কিছু আবিষ্কারের বাণী শোনায, তখনি একদল মুসলিম ঐটাকে ইসলামাইজড করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। কখনো সত্য মিথ্যা যাচাই করার প্রয়োজন মনে করে না। আসলে তারা বিজ্ঞানকেই বেশি বিশ্বাস করে। বিজ্ঞান যে ভুল হতে পারে এটা তারা ভাবতেই পারে না। নিজের অজান্তে তারা কোরআনের নয়, বরং বিজ্ঞানের সত্যতাকে প্রমোট করে। বিজ্ঞানের ওই থিওরি কোরআনের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে যায়। কোনোরকমে একটা আয়াতকে পেঁচিয়ে গোজামিল দিয়ে বিজ্ঞানের সমর্থনে দাঁড় করিয়ে দেয়।

তারপর তৃপ্তির ঢেকুর তোলে। আর অন্যরা বাহবা দেয়। কিছুদিন পর নাস্তিকরা বলে : " বিজ্ঞান আবিষ্কার করার পড়ে সব কিছু কুরআনে পাওয়া যায়, এর আগে ওই তথ্য কোথায় ছিল? এই একটা বাক্য দিয়েই সে আপনাকে এবং কুরআনকে অপমানিত করে দিলো।

বিজ্ঞান তো আরো অনেক কল্প কাহিনী শুনাবে। আপনি কি সবকিছুকেই কুরআন থেকে প্রমানের চেষ্টা করবেন? আর ওই একই কথা শুনবেন? অর্থাৎ বিজ্ঞানের আবিষ্কারের পরেই তা কুরআনে পাওয়া যায়, তার আগে কই ছিল?

ভাই ওরা তো গবেষণাগারে বসে এসব তত্ত্ব বানায় সাইন্স ফিকশন মুভি বানানোর জন্য। বাস্তব পৃথিবীর জন্য নয়। ((তবে হা, কোনো মেশিন বানানোর জন্য

এসব অংকের প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ বর্তমান ইঞ্জিনিয়ারিং ও

টেকনিক্যাল কাজের জন্য। কিন্তু সৃষ্টি তত্ত্বের জন্য ওসব কাব্বালিস্টিক ভ্রান্ত

গাণিতিক সূত্রের প্রয়োজন নেই। কুরআন হাদিসই যথেষ্ট।)) আর আপনি

এগুলোকে ইসলামাইজড করার জন্য অহেতুক পরিশ্রম করছেন? আপনি ভাবছেন,

এসবের দ্বারা অনেকে মুসলিম হবে, মুমিনদের ঈমান বাড়বে? মোটেও না। বরং

সবাই বিভ্রান্ত হচ্ছে, সংশয়ে পড়ে যাচ্ছে, দোমনায় ভুগছে। ঈমান আরো দুর্বল

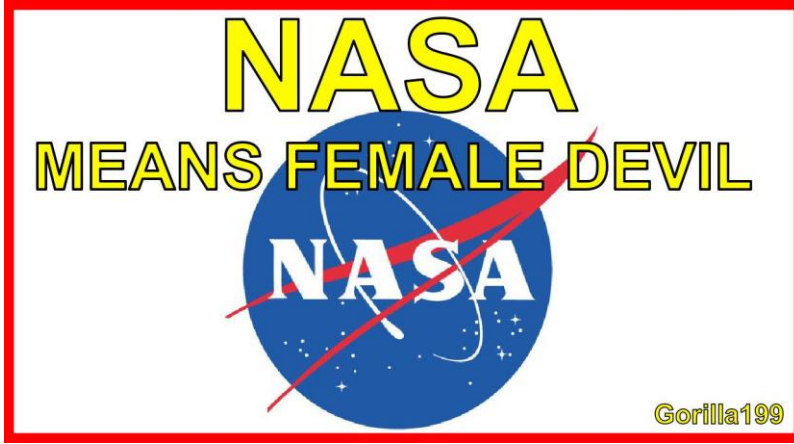
হচ্ছে। আর অমুসলিমরা যারা কোরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেখে ইসলামে প্রবেশ

করছে, তারা তো শুরুতেই ভুল জেনে ইসলামে ঢুকছে। তাদের কাছে সঠিক

ইসলাম প্রচার করা হচ্ছে না।



সঠিক ইসলামকে প্রচার করুন। বিজ্ঞানের প্যাকেটে ঢুকিয়ে কেন ইসলামকে প্রচার করতে হবে? ইসলাম তো স্বয়ংসম্পূর্ণ। কারো কাছ থেকে তো কিছু ধার করার প্রয়োজন নেই। আপনি নিজে কুরআন হাদীসকে সামনে রেখে গবেষণা করুন। ইনশাআল্লাহ, অনেক কিছু আপনি নিজেই বের করতে পারবেন। বিজ্ঞানের আলোকে গবেষণা না করে সুন্নাহর আলোকে গবেষণা করুন।



কাফেররা সৃষ্টি তত্ত্বের হিসাব নিকাশ করতে আলোকবর্ষ খিওরি এপ্লাই করে। আপনি সুন্নাহ খিওরি এপ্লাই করুন। অশ্ববর্ষ। অর্থাৎ, একটি ঘোড়া ১ বছরে কত দূর যায়। সেটাই অশ্ববর্ষ। হাদিসে আকাশ ও জান্নাতের বিস্তৃততার হিসাব গুলো এভাবেই করা হয়েছে। যেমন জমিন থেকে ১ম আকাশের দূরত্ব ৭২ বছরের রাস্তা। অর্থাৎ একটি ঘোড়া ৭২ বছরে যতদূর যেতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, ১ম আকাশ ৭২ অশ্ববর্ষ দূরে।



মনে রাখবেন কাফেরদের নতুন নতুন শব্দ আর থিওরি গুলো শুধু মাত্র ইসলামকে প্রশ্ন বিদ্ধ করার জন্যই। কাফেররা এসব দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটি ধর্মকে দাঁড়া করানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। সুতরাং খুব সাবধান থাকা চাই। ওদের তন্ত্র মন্ত্র গুলো পেলেই গোত্রাসে গিলা যাবে না। এগুলো ওদের ফাঁদ। মুমিন কখনো এক গর্তে দুইবার পা দেয় না।

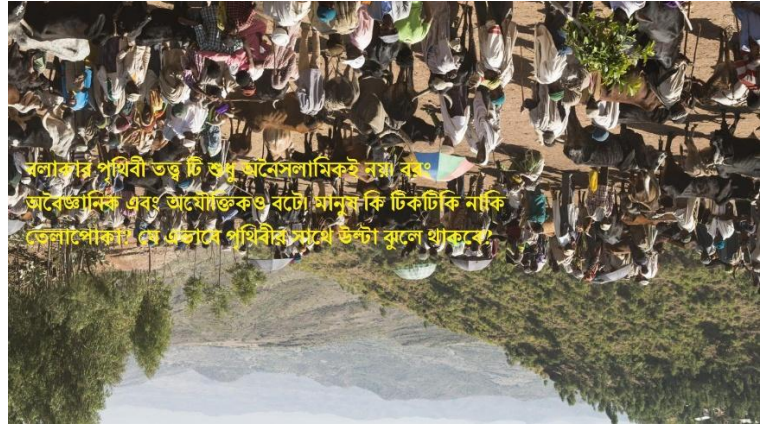
### বলাকার পৃথিবী তত্ত্বটি অবৈজ্ঞানিক ও বিবেক বহির্ভূত:



এটা তো কমন সেন্স। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, বলাকার পৃথিবী তত্ত্বটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। একটু গভীর ভাবে ভেবে দেখুন তো, মানুষ কি টিকটিকি নাকি তেলাপোকা? যেভাবে পৃথিবীর সাথে উল্টা ঝুলে থাকবে? যারা সব কিছু বিজ্ঞান দিয়ে মাপতে চান, তারা বিষয়টা নিয়ে আরেকবার ভাবুন।

এটা কি কোনো বৈজ্ঞানিক চিন্তার মধ্যে পরে? হাহ, যদি মানুষের সুপারম্যান বা স্পাইডার ম্যানের মতো ক্ষমতা থাকতো তাহলেও বিষয়টা মেনে নেয়া যেত। মিথ্যা

গ্রাভিটিকে আছে বলেও যদি ধরে নেই তবুও বিষয়টা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। আল্লাহ মানুষকে কখনোই এভাবে উল্টা ঝুলিয়ে রাখবেন না। এভাবে উল্টা ঝুলে থাকা সম্ভব জীন ও শয়তানদের পক্ষে। ছবি গুলো দেখুন আর ভাবুন এটা মানব সভ্যতার সাথে যায়না।



বরং শয়তানের as above so below (যা উপরে তাই নিচে) নীতির সাথে যায়। অর্থাৎ মানুষ উপরেও আছে নিচেও আছে।



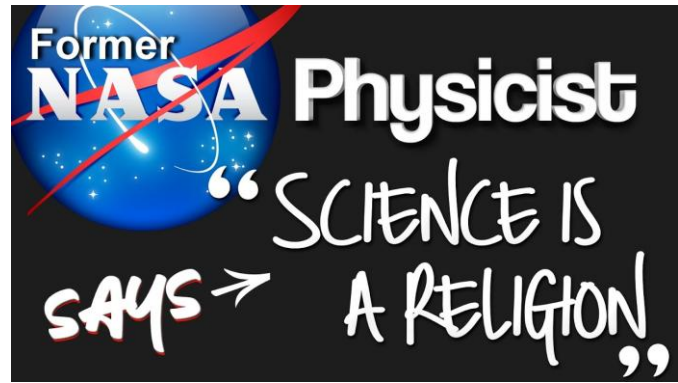
## কল্পবিজ্ঞান প্রেমী নেক্সট প্রজন্মের কলমে সূরা নাসের তাফসীর:

যেহেতু অপবিজ্ঞানপন্থী মডারেটরা, কুরআনকে বিজ্ঞানের সাথে মিলানোর জন্য কুরআনের অপব্যাখ্যা করতে ছাড়েনি। সেহেতু তাদের দ্বারা আরো অনেক কিছুই সম্ভব। তারা পৃথিবীকে বলাকার প্রমানের জন্য "দাহাহার" অর্থ করেছে "বিস্তৃতির" বদলে ডিম্বাকৃতি। গ্রাভিটি প্রমানের জন্য "কিফতানের" অর্থ করেছে, "ধারণকারীর" বদলে আকর্ষণকারী। এভাবে অনেক অর্থকেই তারা বিকৃত করেছে।



এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, এই প্রজন্মের বিজ্ঞানপন্থী মডারেটরা যেহেতু আয়াত বা শব্দকে বিকৃত করেছে। সেহেতু তাদের সন্তানেরা তো পুরো সূরাকেই বিকৃত করে ফেলবে। পরবর্তী প্রজন্ম তো মনে করবে, সূরা নাস মনে হয় নাসাকে উদ্দেশ্য করেই নাজিল

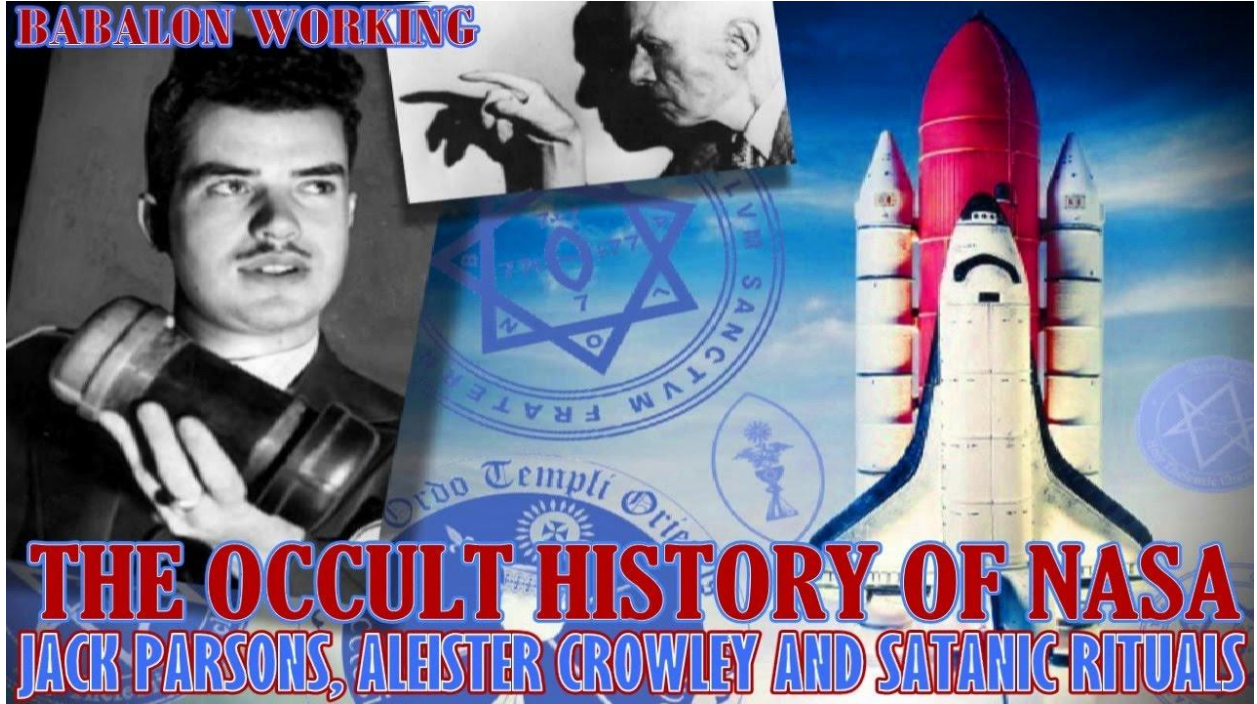
হয়েছে। কারণ তাদের বাপ্ দাদারা যেভাবে নাসার গুণগান করেছে, এবং নাসার সব থিওরিকে ইসলামাইজড করেছে। তাদের এমনটা ভাবাই স্বাভাবিক হবে। তারা (সন্তানেরা) মনে করবে, যেহেতু কুরআনের শেষ সূরা নাস, সেহেতু এটা দ্বারা শেষ জমানার এই গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা নাসাকেই বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ হয়তো আরো একধাপ এগিয়ে বলবে, সিনের নিচে জের দিয়েও পড়া যায় আবার জবর দিয়েও পড়া যায়। আর জবর দিলে তো নাসাঈ হয়। এভাবেও তারা ইজতেহাদ করবে।  
নাউযুবিল্লাহ।



এদের মধ্যে আরেকটি দল আল্লাহর রাসূলের একটি বক্তব্য দিয়েও ইজতেহাদ করবে। তারা বলবে, আল্লাহর রাসূল বলেছেন: শেষ জমানায় খ্রিস্টানদের একটি দল মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব করবে। এটা দ্বারা এই নাসার মানুষদের (নাস) কথাই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, নাসাঈ একমাত্র খ্রিস্টান সংস্থা, যারা কিনা কোরানের আলোকে মহাবিশ্ব নিয়ে গবেষণা করে আমাদেরকে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করছে। সুতরাং নাসার নাসরাই (মানুষেরা) আমাদের সেই শেষ জমানার বন্ধু। দেখেছেন, আল্লাহ এবং তার



রাসূল ১৫০০ বছর আগেই নাসার কথা বলে দিয়েছেন। কুরআন কত বিজ্ঞান ময়??  
আর কিছু লোক বিজ্ঞানের বি ও বোঝেনা, অথচ কথায় কথায় নাসার বিরোধিতা  
করে।



উপরে আপনারা আগামী প্রজন্মের নাসা ও বিজ্ঞানপ্রেমী কিছু মুজতাহিদ(?) বিজ্ঞানীর  
সম্ভাব্য ইজতেহাদ দেখলেন। তবে আমরা আশা করি, এমনটা হবেনা ইনশাআল্লাহ।  
আল্লাহ তায়ালার তার আগেই তাদেরকে সহীহ বুঝ দান করবেন।

**বিজ্ঞানময় নাকি হেকমতপূর্ণ / জ্ঞানগর্ভ / প্রজ্ঞাময় কুরআন?**

সূরা ইয়াসিনের ২ নং আয়াত দিয়ে অনেকেই কুরআনকে বিজ্ঞানময় বলে প্রচার করতে চায়। এবং অপবিজ্ঞানের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। এবার আপনারা নিচে দেয়া সবগুলো স্ক্রিনশট দেখুন।

36:2

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ



By the Quran, rich in wisdom!  
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ  
[ Ya-Sin 36:2 ]

**Shakir** I swear by the Quran full of wisdom  
**Yusuf Ali** By the Qur'an, full of Wisdom,-  
**Pickthal** By the wise Qur'an,

[36] **Ya Seen** : 2

يس

Ya Seen

EN 36 - Yā' Sin 2



Surah Ya Seen Verse 2



I-ḥakīmī wal-qur'ānī

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ

the Wise. By the Quran

Wal-Qur-aanil-Hakeem

Sahih International:

“By the wise Qur'an.

(36:1) Ya'. Sin.<sup>1</sup>

1. Ibn Abbas, Ikrimah, Dahhak, Hasan Basri and Sufyan bin Uyainah have opined that it means, "O man", or "O person". Some other commentators have regarded it as an abbreviation of "Ya Sayyid" as well, which, according to this interpretation, would be an address to the Prophet (peace be upon him).

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝

(36:2) By the Wise Qur'an,

Text
Documents


DETECT LANGUAGE ENGLISH ARABIC BENGAL
BENGALI ARABIC ENGLISH

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ×
বুদ্দিমান কুরআন

Text
Documents

DETECT LANGUAGE ENGLISH ARABIC BENGAL
BENGALI ARABIC ENGLISH

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ×
And the Wise Qur'an



# সুরা ইয়া-সীন

সুরা ইয়া-সীন

on
on

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ইয়া-সীন [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:১ ]

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ
প্রজ্ঞাময় কোরআনের কসম। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:২ ]

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ  
নিশ্চয় আপনি প্রেরিত রসূলগণের একজন। [ সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৩ ]

## Quraan Shareef

36) সূরা ইয়াসীন - Surah Ya-Sin (মক্কায় অবতীর্ণ - Ayah 83)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

▶ 0:00 / 17:40 — 🔊 ⋮

Go to: [Top](#) [10](#) [20](#) [30](#) [40](#) [50](#) [60](#) [70](#) [80](#)

(1) يس

ইয়া-সীন

Ya Sin.

(2) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ

প্রজ্ঞাময় কোরআনের কসম।

By the Qur'an, full of Wisdom,-

(3) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

নিশ্চয় আপনি প্রেরিত রসূলগণের একজন।

Thou art indeed one of the apostles,

1 আহসানুল বায়ান | Tafsir Ahsanul Bayaan

জ্ঞানগর্ভ কুরআনের শপথ, [১]

[১] অথবা এর অর্থ, সুবিন্যস্ত কুরআনের, যা শব্দছন্দ ও অর্থের দিক থেকে সুবিন্যস্ত ও মজবুত। ১ শপথের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে শপথের জওয়াব পরবর্তী আয়াতে।

2 আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া | Tafsir Abu Bakr Zakaria

শপথ প্রজ্ঞাময় কুরআনের,

3 আল-বায়ান ফাউন্ডেশন | Tafsir Bayaan Foundation

বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ।

4 মুহিউদ্দীন খান | Muhiuddin Khan

প্রজ্ঞাময় কোরআনের কসম।



বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ। আল-বায়ান

শপথ হিকমতপূর্ণ কুরআনের। তাইসিরুল

শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের। মুজিবুর রহমান

By the wise Qur'an. Sahih International

## ২. শপথ প্রজ্ঞাময় কুরআনের,

## (২) জ্ঞানগর্ভ কুরআনের শপথ, [1]

তাকসীরে জাকারিয়া

[1] অথবা এর অর্থ, সুবিন্যস্ত কুরআনের, যা শব্দছন্দ ও অর্থের দিক থেকে সুবিন্যস্ত ও মজবুত। ۛ শপথের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে শপথের জওয়াব পরবর্তী আয়াতে।

তাকসীরে আহসানুল বায়ান

Ya-Sin

◀ 440 ▶

Juz 22

যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে চলমানকাউকে ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর যখন সে নির্দিষ্ট মেয়াদ এসে যাবে তখন আল্লাহর সব বান্দা তাঁর দৃষ্টিতে থাকবে। (45)

Ya-Sin

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

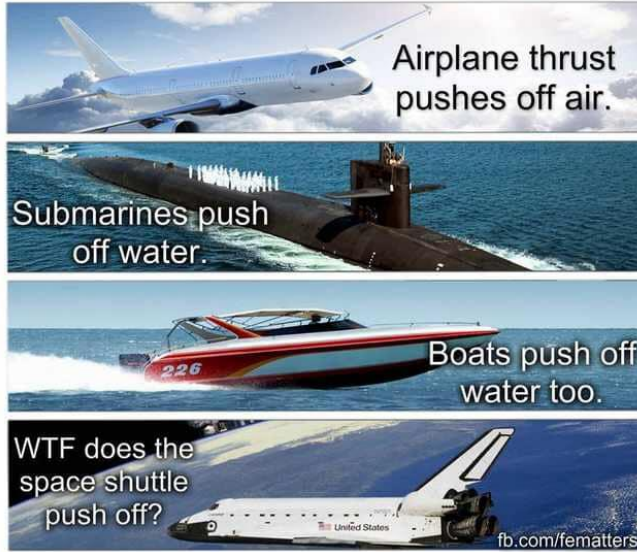
ইয়া-সীন (1) প্রজ্ঞাময় কোরআনের কসম। (2) নিশ্চয় আপনি প্রেরিত রসূলগণের একজন। (3) সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। (4) কোরআন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহর तरফ থেকে অবতীর্ণ, (5) যাতে আপনি এমন এক জাতিকে সতর্ক করেন, যাদের পূর্ব পুরুষগণকেও সতর্ক করা হয়নি। ফলে তারা গাফেল। (6) তাদের

অল্প কয়েক জায়গা ছাড়া বেশিরভাগ জায়গাতেই হেকমতপূর্ণ / জ্ঞানগর্ভ / প্রজ্ঞাময় কুরআন হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে। ইংরেজি, আরবি ও বাংলা সব জায়গায়তে প্রজ্ঞাময় অনুবাদ করা হয়েছে। অথচ কিছু মানুষ এই আয়াতের বিচ্ছিন্ন অনুবাদটি নিয়ে কুরআনকে বিজ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলতে চায়। হায় আফসোস, তারা

মনে করে বর্তমান যুগে অপবিজ্ঞান ছাড়া ইসলামকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাদের ধারণা, মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে হলে ইসলামকে বিজ্ঞানাইজড করে প্রচার করতে হবে। অথচ ইসলাম স্বয়ংসম্পূর্ণ।

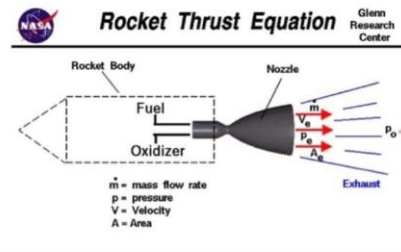
### আউটার স্পেস, ভ্যাকুয়াম চেম্বার বনাম বাস্তবতা:

নভোচারীদের রকেটে করে মহাশূন্যে যাওয়াকে প্রমান করার জন্য ভ্যাকুয়াম চেম্বারের (বায়ু শূন্য চেম্বার) এই কার্টুন দেখানো হয়। আর নাসা প্রেমিকরা কোনো প্রশ্ন ছাড়াই তা মেনে নেয়। ছবি গুলো ভালো করে দেখুন।



If you were smart enough to decipher a simple diagram, you'd realize that NASA is telling you propulsion requires external pressure...

**BUT YOU'RE NOT SMART**



ভ্যাকুয়াম চেম্বারে, বস্তুটিকে সামনে এগোনোর জন্য দেয়ালে ধাক্কা দিতে হচ্ছে। জাহাজ আর বিমান কেও পানি আর বাতাস কে ধাক্কা দিয়ে এগোতে হয়। তাহলে মহাশূন্যে রকেট গুলো কোন জিনিসকে ধাক্কা দিয়ে সামনে এগোয়?



### কার্ভেচার সমাচার : (মুত্তাকী বনাম মডারেট)

সমতলে বিছানো পৃথিবীতে যেমন কোনো কার্ভেচার নেই, তেমনি এতে বিশ্বাসীদের অন্তরেও কোনো কার্ভেচার (বক্রতা) নেই, আলহামদুলিল্লাহ। এদের অন্তরগুলো সহজ ও সরল। খুব সহজেই সত্যকে গ্রহণ করে নেয়।

**CURVATURE**

অন্যদিকে:

কথিত বলাকার পৃথিবীতে যেমন কাল্পনিক কার্ভেচার আছে। ঠিক তেমনি বলাকার পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের অন্তরেও কার্ভেচারে (বক্রতা) পরিপূর্ণ। এদের সামনে সত্যকে যতই উপস্থাপন করা হোক না কেন, এরা গ্রহণ করতেই চায়না।

ইয়া আল্লাহ, আপনি এদের অন্তরের কার্ভেচার (বক্রতা) দূর করে দিন। আর আমাদেরকেও হেদায়েতের উপর অটল রাখুন। অন্তরের বক্রতা থেকে হেফাজত করুন।

### **মুসলমান বিজ্ঞানী নয়, বরং কাফের**

অনেকে মুসলিম নামের সাথে সাদৃশ্য থাকায় কিছু ব্যক্তিকে মুসলিম বিজ্ঞানী বলে গর্ব বোধ করেন। অথচ হক্ক কথা হচ্ছে তাদের নাম দেখে মুসলিম বলে মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে তারা ইসলাম বিহীন, কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। যারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তাদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন, “যারা কাফের হয়েছে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, (কেয়ামতের দিন) যদি সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও তাদের (পাপের কাফফারা হিসেবে দেওয়া হয়), তবুও তাদের তওবা কবুল করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব! আর তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।” সূরা আলে-ইমরানঃ ৯১।

সুতরাং, দ্বীনি ভাই ও বোনদের প্রতি আমাদের আহবান, কোন কাফেরকে মুসলমান বলে গর্ব বোধ করবেন না। আল্লাহ তাআ'লা আমাদের রব্ব, ইসলাম আমাদের

দ্বীন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের রাসুল, কুরআনুল কারীম আমাদের কিতাব — আমাদের সম্মানের জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট, আলহা'মদুলিল্লাহ। বিভিন্ন বই-পুস্তকে ওমর খৈয়াম, ইবনে সিনা, আব্দুস সালামের মতো 'যিন্দীক' লোকদেরকে বড় মুসলিম বিজ্ঞানী ও দার্শনিক বলে প্রচার করা হয়। অথচ তারা ইসলাম থেকে অনেক দূরে ছিলো, যা তারা নিজেরাই স্পষ্ট করে গেছেন।

(১) ওমর খৈয়ামের কুখ্যাত বইয়ের নাম হচ্ছে 'রুবাইয়াত', যার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ

- তাক্বদীর বা আল্লাহ তাআ'লা মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং নিন্দা। এটা বড় কুফুরী কাজ, যার কারণে একজন মানুষের ঈমান নষ্ট হয়ে মূর্তাদ হয়ে যাবে।

- বিয়ে বহির্ভূত অবৈধ প্রেম ভালোবাসার কল্ল-কাহিনী, যা নষ্ট চরিত্রের লোকদেরকে আকর্ষণ করে।

- সুস্পষ্ট ধর্মদ্রোহীতা, ধর্মীয় বিধি-বিধানকে অস্বীকার করা এবং সেইগুলো নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা। একমাত্র নাস্তিক ছাড়া কোন ঈমানদান এমন কাজ করে না।

- সম্মানিত আলেম ওলামাদেরকে গালি-গালাজ করা। এটা মুনাফেক লোকদের কাজ।

(২) ইবনে সিনা এবং আল-ফারাবীঃ

ইবনে সিনা বড় চিকিৎসক এবং একজন বিজ্ঞানী হতে পারেন, কিন্তু তিনি ছিলেন অমুসলিম বা কাফের। তার সম্পর্কে ইমাম ইবনুল কাইয়িম আল-জাওজিয়া রাহি'মাহুল্লাহ বলেন, “ইবনে সিনা হচ্ছে একজন কাররামিয়া বাতেনিয়া (শিয়াদের কাফের একটা ফেরকা), যারা এই পৃথিবীর শুরু এবং শেষ আছে তা বিশ্বাস করেনা। তারা বিশ্বাস করেনা যে, এই পৃথিবীর একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং তারা আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসুলদেরকেও বিশ্বাস করেনা।” তিনি আরো বলেছেন, “এই গোমরাহ লোক এবং তার অনুসারীরা আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, নবী-রাসুল এবং পরকাল বিশ্বাস করে না।” ইগাসাত আল-লাহফানঃ ২/২৮৬-২৮৭।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহি'মাহুল্লাহ একজন শাফেয়ী আলেমের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন, “ইবনে সিনা এবং আবু নাসের আল-ফারাবী মতো লোকেরা বিশ্বাস করে যে, এই পৃথিবী কখনো ধ্বংস হবেনা এবং আল্লাহ কোনকিছু ঘটান পূর্বে তা কখন, কিভাবে ঘটবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা জানেন না (নাউযুবিল্লাহি মিং যালিক)। ইবনে সিনার সময়ের আলেমরা তার এবং আল-ফারাবীর ব্যপারে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তাদের এই আকিদাহ কুফুরী, এবং তা মুসলিমদের আকীদাহর সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।” লিসান আল-মীযানঃ ২/২৯৩।

আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমিন রাহি'মাহুল্লাহ এবং ফযীলাতুশ-শায়খ সালেহ আল-ফাউজান হা'ফিজাহুল্লাহ সহ অন্যান্য আলেমদের ফতোয়া



হচ্ছে, “ইবনে সিনার নামে কোন স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম রাখা জায়েজ নয়।”

(৩) পাকিস্তানী বিজ্ঞানী আব্দুস সালাম ১৯৭৯ সালে ফিজিক্স বা পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। নাম শুনে মুসলিম মনে হলেও আসলে তিনি ছিলেন একজন কাদিয়ানি, যারা পাকিস্তানে নিজেদেরকে আহমাদীয়া মুসলিম বলে পরিচয় দিয়ে মুসলিমদেরকে ধোঁকা দেয়। তাদের বিশ্বাস হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবী নন, গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নামের এক দাজ্জালকে তারা নবী বলে বিশ্বাস করে ও অনুসরণ করে। এই উম্মতের ইজমা অনুযায়ী ভন্ড নবী গোলাম আহমদের অনুসারী কাদিয়ানিরা হচ্ছে কাফের। যে ব্যক্তি কাদিয়ানীদেরকে কাফের মনে করবে না, সে নিজেই কাফের হয়ে যাবে।

(৪) এপিজে আবুল কালাম আজাদঃ



২০১৫ সালে মৃত্যবরণ করা ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি, তিনি ছিলেন একজন আদর্শ ‘সেকুলার’ বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, কিন্তু তিনি মুসলিম ছিলেন না। আর



একারণেই ভারতের মতো উগ্র হিন্দু রাষ্ট্রে আদর করে তাকে রাষ্ট্রপতি বানানো হয়েছিলো। কারো বাবা-মা মুসলমান থাকলেই বা কারো নাম মুসলমানদের মতো হলেই তিনি মুসলমান হয়ে যান না। মুসলমান হতে হলে ইসলাম কবুল করে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলকে মেনে নিয়ে জীবন পরিচালনা করতে হয়।

(৫) বাংলাদেশের কিছু ঔপন্যাসিক, বিজ্ঞানী দাবীদার লোকও এই তালিকায় রয়েছেন। তবে সুশীল, মুক্তমনা ইত্যাদি চমকপ্রদ নাম নিয়ে নির্লজ্জভাবে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দল এবং প্রতিবেশী হিন্দু দেশের দালালী করার মতো ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত থাকার কারণে তাদের ব্যপারে আলোচনা করে সময় নষ্ট করলাম না।

সর্বশেষ, দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য।

### **দার্শনিক ইবনে সিনার আক্বিদা, ধর্মীয় বিশ্বাস..!**

ভূমিকা:

আপনি যদি ধর্মে বিশ্বাসী কিংবা আস্তিক হন এবং আপনি সমমনা ইখুয়ানী/খারিজি/রাফেজি/ থেকে শুরু করে বিন লাদেনের কর্মকান্ড যেকোন কিছুই সমালোচনা করেন না কেন, আপনাকে অবধারিত ভাবেই ইসলাম বিদ্রোষী ষড়যন্ত্রকারী বলা হবে। এমনকি আপনি যদি ইতিহাসের কোন ভুল তথ্য সঠিক করে

দেন তাতেও রেহাই নাই। এমনকি মধ্য যুগীয় স্বনামধন্য মুসলিম বিজ্ঞানীদের ইশ্বর ধারণার সাথে যে কোরানের ইশ্বর ধারণার খুব কমই মিল আছে সেকথা বললেও অবধারিতভাবে আপনাকে ট্যাগ করা হবে ইসলাম বিদ্রোহী হিসাবে।

যেমন:

বাস্তবতা হচ্ছে মুসলিম নামধারী বিজ্ঞানীরা প্রায় সবাই ইসলামে বিদ্রোহী ছিলেন দুই একজন ছাড়া! অন্যদিকে জন্মসূত্রে অমুসলিম বিজ্ঞানীরা কেউ তাঁদের ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না, কেউ কেউ হয়ত নামকাওয়াস্তে আস্তিক ছিলেন। এই বাস্তবতাটা একশ্রেণীর লোক মেনে নিতে পারছে না তাদের অন্ধ ভক্তির জন্য।

তেমনি একজন দার্শনিক "ইবনে সিনার আকিদা" নিয়ে আজ আলোচনা করব-  
(ইনশা আল্লাহ)



[OBJ] ইবনে সিনার দৃষ্টিতে আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তা :

৯৮০ খৃস্টাব্দে ইবনে সিনার জন্ম বোখারার নিকটবর্তী আফসানা নামক এক গ্রামে। ইবনে সিনার বাবা ছিলেন তুরস্কের বলক প্রদেশের এবং একজন ইসমাইলী শিয়া! ধর্মতাত্ত্বিক এবং দার্শনিক চিন্তাভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক দিক থেকেই তিনি ছিলেন কোরআনের মৌলিক বিশ্বাসের পরিপন্থী।

ইবনে সিনার (৯৮০ খৃঃ - ১০৩৭ খৃঃ) সময় আরবীয় দর্শন এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌছায়। তাকে একাধারে দর্শন এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের রাজপুত্র নামে অভিহিত করা হত। পশ্চিমের এরিস্টটল, প্লেটো, নব্য প্লেটোবাদ, এবং স্টায়িক দর্শনের উপর ব্যাপক জ্ঞানার্জন করেন তিনি এবং একই সাথে প্রাচ্যের মনিষীদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং কাঠামো সম্পর্কেও ব্যাপক ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কিন্তু এগুলির কোনটিকেই পুরোপুরি ভাবে মেনে চলতেন না বা অনুসরণ করতেন না। তবে সবগুলো বিশ্বাস থেকেই কিছু কিছু উপাদান নিয়ে নিজস্ব একটি বিশ্বাসের ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন। তার সেই ধর্মীয় বিশ্বাসে ইশ্বর (আল্লাহ), মানুষ, এবং এই মহাবিশ্বের সবকিছু পরস্পরের উপর নির্ভরশীল বা মুখাপেক্ষি ছিলো না। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষ এবং সৃষ্টিকর্তা পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলেও মানুষ সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। আল্লাহ মানুষের সাথে সরাসরি কোন যোগাযোগ রাখেন না এবং বিশ্বটাকে নিয়ন্ত্রণ করেন না। ইবনে সিনার সাথে এরিস্টটলের ইশ্বরের পার্থক্য আছে। এরিস্টটলের ইশ্বর এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেননি এবং এটা নিয়ে তার কোন মাথা ব্যাথাও নেই। ইবনে সিনার ইশ্বর (আল্লাহ) মধ্যপ্রাচ্যীয় ইশ্বর (Semitic - আরব, হিব্রু, আসীরিয়, ফিনীসিয় ইত্যাদী) কিন্তু তার নিজস্ব দর্শন দ্বারা পুনঃনির্মিত ইশ্বর। তার আল্লাহর গুণাবলীর যৌক্তিক ব্যাখ্যা এবং সৃষ্টিশীলতার সাথে স্পষ্টতই কোরানের আল্লাহর গুণাবলীর যৌক্তিক ব্যাখ্যা এবং সৃষ্টিশীলতার পার্থক্য রয়েছে।

□ ইবনে সিনার বিশ্বাসের সাথে কোরআনের বিশ্বাসের সংঘর্ষ যেখানেঃ

১. মানুষ এবং মহাবিশ্বের সৃষ্টিঃ

ইবনে সিনার মতে এ বিশ্বের কোনকিছুই শূন্য থেকে (Ex Nihilo) সৃষ্টি হয়নি। পদার্থের শুরু কিংবা শেষ নাই.... পদার্থ চিরন্তন এবং জগতের সৃষ্টি সময় এবং স্থান দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় - এই জগতের কোন শুরু নেই এবং কোন শেষও নেই।

কোরআনের বিশ্বাস অনুযায়ী আল্লাহ সবকিছুই শূণ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন এই মতবাদ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। বরঞ্চ এ জগৎ তার ইচ্ছাশক্তির ফলস্বরূপ তার সত্ত্বা থেকে বিকিরিত। সক্রিয় বুদ্ধিমত্তা সর্বপ্রথম বিকিরিত হয়, এরপর আত্মা এবং সর্বশেষ দেহ।

সৃষ্টিকর্তা সরাসরি তার সৃষ্টির সাথে কোন যোগাযোগ রাখেন না। আল্লাহ যতদিন ধরে আছে, এই জগতের অস্তিত্বও তত দিনকার। আল্লাহ এ বিশ্বকে কোন এক বিশেষ সময়ে সৃষ্টি করেছেন এ মতের বিরোধী ছিলেন। এ বিশ্ব পরম স্রষ্টা থেকে আদি বুদ্ধি এবং অন্যান্য বুদ্ধির মধ্য দিয়ে বিকিরণ হয়ে অনন্তকাল ধরে বিরাজমান রয়েছে। তিনি আর বলেন সর্বত্র বিরাজিত পরম সত্ত্বা এমন কোন সুশৃঙ্খল এবং মঙ্গলকর বিশ্ব সৃষ্টি করবেন না যেটা তার স্হায়িত্বকে সময়ের প্রেক্ষিতে অতিক্রম করতে সক্ষম নয়। ইমাম গাজালী চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন, আল্লাহ যদি একমাত্র স্বাধীন অমুখাপেক্ষী সত্ত্বা হন তবে বিশ্বকে তার পরেই সৃষ্ট হতে হবে, তা অস্তিত্ব ও সময় - দুটোরই মানদণ্ডে। সুতরাং তা অনাদি-অনন্ত হতে পারে না। এই দর্শনকে কুফরী বলে আখ্যায়িত করেছেন ইমাম গাজালী।

## ২. আল্লাহর স্বরূপ এবং তার সর্বজ্ঞানঃ

ইবনে সিনার মতে আল্লাহর স্বরূপ খুবই সাধারণ। তিনি আল্লাহর বিশুদ্ধ একক সত্তায় বিশ্বাস করতেন। তাঁকে অস্তিত্ব সম্পর্কিত দর্শনের কোন শব্দাবলী বা বৈশিষ্ট্য দিয়ে চিহ্নিত করা যাবে যাবে না এবং তাঁকে বিভিন্ন গুণাবলী দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা হলো তাঁর একত্ববাদের স্পষ্ট লংঘন। মুতাজিলাদের মতোই তিনি আল্লাহর একক সত্তায় তাঁর আলাদা আলাদা গুণের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। অপরদিকে কোরান অনুযায়ী আল্লাহ বিভিন্ন মানবিক গুণাবলীর অধিকারী এবং তার প্রায় শ'খানেক নাম আছে। ইবনে সিনা যে আল্লাহর কথা বলেন সে আল্লাহ এক পরম, বিশুদ্ধ একক

শ্রষ্টা, আমাদের পার্থক্য জগতের তুলনায় সেই শ্রষ্টা বিকারহীন এক সত্ত্বা। সমগ্র বিশ্ব সেই শ্রষ্টার জ্ঞান প্রক্রিয়ার ফলাফল।

ইবনে সিনার মতে আল্লাহ এ পৃথিবীর সব কিছু সম্পর্কেই একটা সামগ্রিক ধারণা রাখেন কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান রাখেন না। যেহেতু শ্রষ্টার জ্ঞান প্রক্রিয়ার ফলাফল এই বিশ্ব, সুতরাং সার্বিক বস্তু যেমন গ্রহ, সূর্য, তারা, গাছ, মাছ, মানুষ এইরকম সার্বিক বস্তু সম্পর্কে শ্রষ্টা সচেতন এবং এগুলো তার সার্বিক জ্ঞানের অংশ। কিন্তু শ্রষ্টা সার্বিক ‘মানুষ’ সম্বন্ধে জ্ঞান রাখলেও তিনি বিশেষ কোন ব্যক্তিবিশেষ যেমন ‘ইবনে সিনা’, বা হোরাস সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখেন না। ‘মানুষ’ তার জ্ঞান চিন্তার ফসল, এই কারণে মানুষ কি তা তিনি জানেন কিন্তু ইবনে সিনাকে তিনি চেনেন না।

### ৩. মৃত্যু পরবর্তী দৈহিক পুনরুত্থানঃ

ইবনে সিনার মতানুসারে মানুষ আত্মা এবং দেহের সমন্বয়ে গঠিত। তবে কোরানে স্পষ্টভাবে মৃত্যুপরবর্তী দৈহিক পুনরুত্থানের যে বর্ণনা দেয়া আছে সুনির্দিষ্টভাবে তিনি তা অস্বীকার করেছেন। তার মতে কোরানের বর্ণনা অনুসারে দৈহিক পুনরুত্থান সম্ভব নয়। এবং তা যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করাও সম্ভব নয়। তিনি আত্মার একত্বে বিশ্বাস করতেন। তার মতে, মৃত্যুর পরে পুণ্যাত্মা ফিরে যাবে বুদ্ধির জগতে, এ পর্যায়ে আত্মা আপন বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব হারিয়ে শাস্ত বুদ্ধিজগতের সাথে একাত্মতা লাভ করবে।

### ৪. নবীদের বা নবুয়্যাত সম্পর্কিত ধারণার সংঘর্ষঃ

নবুয়্যাত প্রাপ্তি সম্পর্কে ইসলামের ধারণাকে তিনি নামমাত্রে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু তিনি নিজের মত করে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কোরআনের নবী-রাসুলরা প্রত্যেকেই প্রেরিত পুরুষ, অনেকেই আসমানি কিতাব প্রাপ্ত। অনেকের সাথেই জিব্রাইল সরাসরি যোগাযোগ করত, এবং স্বশরীরে আল্লাহর সাক্ষাত প্রাপ্ত। ইবনে

সিনার মতে নবীরা আল্লাহর মুখপাত্র হিসাবে অর্পিত (Endowed) এবং মনোনীত/আদেশপ্রাপ্ত (Ordained) নন। আসলে তারা মানবীয় গুণাবলির অধিকারী সাধারণ মানুষ যারা কিনা সমাজের চলমান সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজেরই সৃষ্টি। সমাজে কিছু মানুষ থাকে যাদের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নৈতিকতার ক্ষমতা অন্যদের তুলনায় বেশী থাকে। এই নেতা- নবীর উচ্চতর অন্তর্জ্ঞান (Intuition) ক্ষমতার সুবিধা থাকার কারণে গোত্রের কিংবা সমাজের প্রয়োজন এবং সমস্যাগুলো ভাল বুঝতে পারেন। এইসব সমস্যার সমাধানে তার প্রখর কল্পনা শক্তি তাকে সাহায্য করে এবং তার বক্তব্য সাধারণ মানুষদের সফলভাবে বোঝানোর ক্ষমতা থাকে এবং তাদের মাঝে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা থাকে। তার বক্তব্যের রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট থাকে। হয়ত তার পক্ষে সক্রিয় বুদ্ধিমত্তার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হলেও হতে পারে। সেই সক্রিয় বুদ্ধিমত্তা হতে পারে সম্ভাব্য, বাস্তব কিংবা আরোহিত বুদ্ধিমত্তা যাকে খ্রীস্টানদের 'হোলি ঘোস্ট' কিংবা ইহুদী-মুসলমানদের জিব্রাইলের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। তবে নবীদের সেই জ্ঞান তার নিজস্ব উপলব্ধীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার কথা মাথায় রেখে নবী তাকে রূপক কিংবা প্রতিকী ভাষায় সাধারণ্যে উপস্থাপন করেন। আর সাধারণ মানুষেরা সেটাকেই আক্ষরিক অর্থে ধরে নেয়। কিন্তু জ্ঞানী মানুষেরা কখনও তা করে না।

#### ৫. সূফীবাদঃ

ইবনে সিনার সবচাইতে উল্লেখযোগ্য দর্শনের বই হচ্ছে আল-সিফা (নিরাময় -

**The Cure)।** এটা সম্ভবত একজন মানুষের লেখা দর্শনের উপর সবচাইতে বড় বই। এতে যুক্তি, পদার্থ বিদ্যা, অধি বিদ্যা, ভূ-তত্ত্ব, জলবায়ু বিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা, গণিত এবং মনবিদ্যা স্থান পেয়েছে। তার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দর্শনের বই আল ইশারাত ওয়া আল তামজিহাদ (Direction and

**Notices)।** তিনি সুফিবাদের উপর তিনটি অধ্যায় এই বইতে লিখেছেন।

সুফিবাদের উপর তার আরও ৩২টির মত প্রবন্ধ/নিবন্ধ আছে। শুধুমাত্র পার্শ্ব জগতের ভোগ-লালসা থেকে বিরত থাকাটাই তার কাছে যথেষ্ট মনে হয়নি। তিনি মনে করতেন জ্ঞানের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য উদ্ধাসনের

**(Illumination)** চেষ্টা করা উচিত। আর উদ্ধাসন সম্ভব জাগতিক এবং মহাজাগতিক জগতের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে। উদ্ধাসনের এই তত্ত্বটি নিকট প্রাচ্য (পারস্য) এবং নব্য প্লেটোনিক (গ্রীক) মতবাদের বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণ। আর এরই মাধ্যমে ইবনে সিনা সুফীবাদের এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেন যা হিকমত আল ইশরাক **(The illuminative one)** নামে পরিচিত। তার ভাবশিষ্য আল সুহারোয়ার্দি পরবর্তিকালে সুফীবাদের এই শাখাটির প্রচার এবং প্রসার ঘটান।

৬. একমাত্র আল্লাহই সবকিছুর নিয়ন্ত্রক:

ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী আল্লাহ হলেন যা কিছু ঘটে তার একমাত্র কার্যকর। কোরআনে সুরা আল ইমরানের আয়াত নাম্বার ২৬-২৭ এ কথা পরিষ্কার ভাবে বলা আছে।

আল্লাহ ছাড়া আর কারও পক্ষে কোন কিছু ঘটানো সম্ভব না। ইবনে সিনা এই মতের বিরুদ্ধে ছিলেন। তার অধিবিদ্যা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী মানুষ এবং অন্য প্রাণী কিংবা এমনকি জড়বস্তুও আল্লাহর সাহায্য ছাড়াই কোন কিছুর সংঘটনের কারণ হতে পারে।



দুটি জিনিষের উপর ইবনে সিনার আকর্ষণ/মোহ ছিলো সর্বজনবিদিত - তার একটি হল ক্রীতদাসী এবং অপরটি মদ! মদ্যপান ইসলাম ধর্ম' মতে কঠোরভাবে নিষেধ। মদের প্রতি তার আকর্ষণের যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন সেটা খুবই চিত্তাকর্ষক। তিনি বলেছেন ধর্মীয় নিয়ম অনুসারে মদ বোকা/নির্বোধদের (fool) জন্য নিষিদ্ধ। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক আইন অনুসারে বুদ্ধিমানদের জন্য মদ হালাল।

তার সম্পর্কে আরো এসেছে:

তারা যখন এখানে এসে পৌঁছলো তখন তারা দেখতে পেল যে রাজার সভা চলছে।  
রাজা তাদেরকে ডাক দিয়ে বললেন, "আজকের দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"  
তিনি কিছু বাদশাহর মন্ত্রী হনাতারা তাকে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রাখতেন। কাজ থেকে  
অব্যাহতি পেলে নর্তকীর আয়োজন হত ও মদের ব্যবস্থা করা হত।(সীয়ারু  
আ'লামিন নুবালা ১৭/৫৩৩)

10/10/2016

ইবনে সিনার উপরোক্ত আক্ফিদা- বিশ্বাসের চরম বিরোধীতা করে তাকে

জিন্দিক, কাফির ফতওয়া দিয়েছেন! তার প্রতি আলেমদের এই বিরোধীতার মূলে রয়েছে মেটা ফিজিক্সে ইবনে সিনার নিজস্ব দর্শন।

তার বিরুদ্ধে কাফের ফতোয়া দেয়া হয় নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে -

#### □ প্রথমত:

ইবনে সিনা তার দর্শনে বিশ্বকে চিরজীবী দাবী করেন যার কোন শুরু নেই। যেখানে মুসলিমরা বিশ্বাস করেন আল্লাহ শূন্য থেকে এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন।

#### □ দ্বিতীয়ত:

তিনি বলেন, আল্লাহ সৃষ্টি এবং ধ্বংস সম্পর্কে সাধারণ ভাবে জানেন, কিন্তু পুংখানুপুঙ্খ ভাবে নয়। যেখানে মুসলিমরা বিশ্বাস করে থাকেন, আল্লাহ আক্ষরিক অর্থেই প্রতিটি বিষয় অবগত।

#### □ তৃতীয়ত,

তিনি শারীরিক পুনরুত্থান নয়, বরং আত্মিক পুনরুত্থানের উপর জোড় দেন। মূলত এই তিনটি কারণে ইমাম গাজালীও ইবনে সিনাকে কাফের সাব্যস্ত করা বাধ্যতামূলক বলে দাবী করেন।

একজন যুক্তিবাদী মানুষ হিসাবে মক্কা-মদীনা বনাম এথেন্স-আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যে তিনি এথেন্স-আলেকজান্দ্রিয়াকে বেছে নিয়েছিলেন। তার পূর্বসূরী আল কিন্দী এবং উত্তরসূরী ইবন রুশদের মত তাকেও কাফের ঘোষণা করা হয়েছিলো। আলেমদের পরামর্শের ভিত্তিতে আব্বাসীয় খলিফা আল মুস্তানজিদ (মৃত্যু ১১৭০ খৃঃ) তার সব বই পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন। নাস্তিকতা, ইসমাইলী ধর্মতাত্ত্বিক এবং

রাজনৈতিক মতাদর্শ ধারণ করা এবং প্রচার করায় তিনি বারবার পাড়ি জমান এক দেশ থেকে আরেক দেশে।

□ রেফারেন্সঃ

- ১) Islam a way of life By Phillip K. Hitti
- ২) Internet Encyclopedia of philosophy (A peer reviewed academic source): Avicenna
- ৩) The philosophy book by Dorling Kindersley

বি:দ্র:-পোস্টটিতে শুধুমাত্র ইবনে সিনার ইশ্বরে (আল্লাহ) বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইবনে সিনার জীবনী কিংবা তার অবদান এই পোস্টের আলোচ্য বিষয় নয়!

## ইবনে সিনা সম্পর্কে অজানাকে জানুন! তিনি মুসলিম নাকি কাফির?

ইবনে সিনার পরিচয় : তার পুরো নাম, আবু আলী হাসান ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু হাসান ইবনু আলী ইবনে সিনা আল-ফারসিয়্যা। তিনি ৭ ই আগষ্ট ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে বুখারার খোরাসান শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। পরে ইরানের হামদান শহরে ৫৭ বছর বয়সে ১০৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি একাধারে কবি, দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ এবং চিকিৎসা শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। শিয়া পরিবারে তার জন্ম হয়।



যাইহোক, ইবনে সিনা সম্পর্কে শায়খ মাহমুদুল হাসান সাহেবের তাহকীকগুলোর নমুনা সালফে সালেহিনদের কিতাব গুলাতেও পাওয়া যায়। নিচে তার কিছু নজীর দেখানো হল-

আল্লামা ইবনু তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) তাকে **রাফেজী শিয়া** বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি আরো বলেন : ‘সে ইসলাম পরিপন্থী বহু কথা বলত এবং সাহাবীদের গালমন্দ করত ।’ (বিস্তারিত দেখুন- আর রাদ্দু আলাল মানতিকিয়্যিন পৃষ্ঠা নং ১৪১; নাক্বদুল মানত্বিক পৃষ্ঠা নং ৮৭)

ইমাম যাহাবী (রহ) ইমাম গাযালীর বরাত দিয়ে ফারাবী ও ইবনু

সীনাকে **কাফের** বলেছেন।

كفره دقو، لات ح تمل وأشد ياء وغيره ألد فاء ك تاب و له  
ألفاربى' وك فر ألد ضلال' من ألد مذقذ ك تاب ف ي ألد غزال ي  
(সূত্র : সিয়রু আলামিন নুবালা ১৭/৫৩৫)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যুম তাকে **ইমামুল মুলহিদ** (মুরতাদদের ইমাম)

বলেছেন।

ورسله وك ت به وملائ ك ته ب ا لله ل كاف ري ن ا الم لحد ين إمام  
(সূত্র : ইগাসাতুল লাফহান ২/২৬৭, ৩৭৪) الآخر وال يوم

ইমাম ইবনুস সালাহ তাকে মানুষদের মধ্যে **শয়তান** বলে আখ্যায়িত করেছেন।

الإذ س ش ياط ين من شيطاناً كان  
(সূত্র : ফাতাওয়ায়ে ইবনুস সালাহ ১/২০৯)

ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী (রহ) তার জন্য যাহাবীর

উদ্ধৃতি দিয়ে **অভিশাপ** দিয়েছেন, যেন আল্লাহ তার প্রতি রাজী না থাকেন।

তার রচিত “লিসানুল মীযান” কিতাবো

عنه ال له ر ضي لا

ইমামুল আসর সাইয়িদ আনওয়ার শাহ আল কাশ্মিরী (রহ) তাকে **মুরতাদ**

**যিন্দিক, শিরকের** দিকে আহ্বানকারী বলেছেন।

الردى شرك مدى غدا مطي ال قر ال زنديق الم لحد س ي ن ا ب ن  
(সূত্র : ফয়যুল বারী ১/১৬৬) ال شيطان و شري طة

শায়খ ইবনু বায (রহ) তিনিও ফারাবী এবং ইবনু সীনার বিরুদ্ধে বলেছেন। তাদের

নামে মুসলিমদের নাম রাখা উচিত হবে না বলেছেন। (দেখুন — ফাওয়ায়েদুল জালিয়্যাহ, যাহরানী পৃষ্ঠা ৩৭)

শায়খ ইবনুল ইমাদ বলেছেন অধিকাংশ আলেমের মতেই ইবনু সীনা **কাফের**। এরপর তিনি ইমাম গাযালীর “আল মুনকিয় মিনাদ দ্বলাল” কিতাবের হাওয়ালা দিয়ে বলেঃ এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ফারাবী ও ইবনু সীনাহ **কাফের**। (সূত্র : শাযারাতুয যাহাব ২/৩৫৩)

আমাদের সবার জন্য প্রকৃত ইতিহাস থেকে সঠিক তথ্য খোঁজা এবং অন্ধভাবে কারো ভক্ত হওয়া থেকে বেছে থাকা উচিত। ব্যক্তি যত বড় হোক, কুফর শিরক এবং বিদাত ও পথভ্রষ্টতার সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেলে তখন তার আর রক্ষা নেই। তাদের সমুদয় কুফুরি এবং শিরিকি থেকে আল্লাহ আমাদের হিফাযাত করুক। (আমিন)।

**“প্যারাদক্সিক্যাল সাজিদ এ আক্বীদাগত বিভ্রান্তি।”**

বিসমিল্লাহ। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা’আলার। শতসহস্র দয়া ও শান্তি বর্ষিত হোক প্রাণাধিক প্রিয় নাবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি যিনি বলেছেন:

তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখবে; সুতরাং তোমরা আমার সুনাত ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদ্বীনের পদ্ধতি মেনে চলা (আবু দাউদ, ৪৬০৭)

.

[বিঃদ্রঃ আরিফ আজাদ ভাইয়ের ইসলামের খেদমতকে কোনোক্রমেই ছোট করছি না এবং তার কোনোরূপ সম্মানহানি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সত্য তুলে ধরাই আমাদের উদ্দেশ্য]

.

বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানকে মানদণ্ড সাবস্ত করে কুরআন বোঝার চেষ্টা একটি চরম ফিতনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও আহলুল ইলমগণ কুরআনকে নব্য আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক থিউরি দিয়ে ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। তারপরও কিছু ইসলাম দরদী ভাই নাস্তিকদের কুপোকাত করতে ও ইসলামের সত্যতা নিশ্চিত করতে কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনে বদ্ধপরিকর। এই সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে তারা ইসলামি আক্বীদা যা কুরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তার সীমানা-ও ক্রস করে ফেলেন।

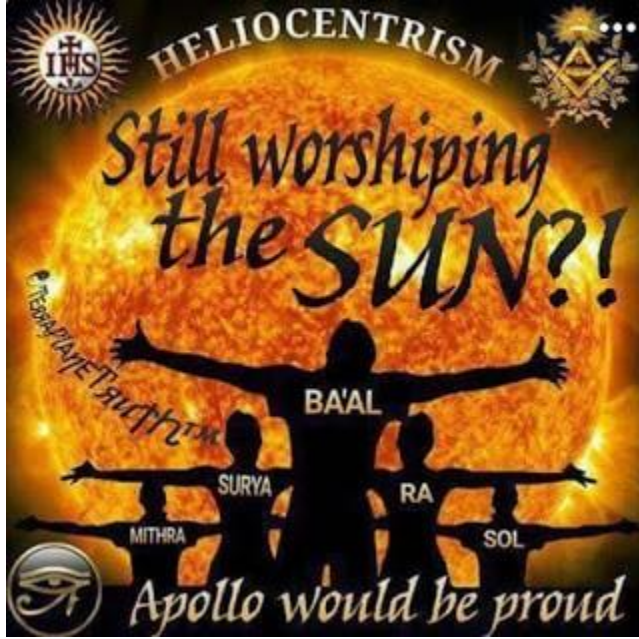
যে বইটির আক্বীদাগত বিভ্রান্তি নিয়ে আজ আলোচনা করবো তা কোন অচেনা বই নয় বরং বেস্ট সেলার ও নাস্তিক বিরোধী বই হিসাবে এটি সুপরিচিত। আক্বীদার বই না চিনলেও যুবক-যুবতীরা এই বই চিনতে ভুল করবেন না। হ্যাঁ আমি

“প্যারাডক্সিক্যাল\_সাজিদ” বইটির কথা বলছি।

প্রথমে আমরা বইটির বক্তব্য উপস্থাপন করবো তারপর কুরআন, সুন্নাহ ও উলামাদের স্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা সেটি পর্যালোচনা করবো। ইনশাআল্লাহ ওয়া বিল্লাহিত তাওফীক।

.

□ প্যারাডক্সিকাল সাজিদ বইয়ে “কোরআন কি সূর্যকে পানির নিচে ডুবে যাওয়ার কথা বলে?” -এই শিরনামে যে গল্পটি বর্ণিত হয়েছে সেই গল্পে ‘মফিজুর রহমান’ নামক চরিত্র যিনি মূলত একজন নাস্তিক, তিনি সাজিদকে প্রশ্ন করেন যে,  
-সূর্যাস্ত সূর্যোদয় কেন হয় বাবা? বিজ্ঞান কি বলে?



জবাবে সাজিদ বলে , ‘স্যার সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘুরে। সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরার সময়, পৃথিবী গোলাধ্বের যে-অংশটা সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে, সে অংশে তখন সূর্যোদয় হয়; দিন থাকে। ঠিক একইভাবে, পৃথিবীর গোলাধ্বের যে-অংশটা তখন সূর্যের বিপরীত দিকে মুখ করে থাকে, তাতে তখন সূর্যাস্ত হয়; রাত নামে।

আদতে, সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয় বলতে কিছু নেই। সূর্য অস্তও যার না, উদিতও হয় না। পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে আমাদের এমনটি মনে হয়।’

-[প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ; গল্প নং ৯; পৃষ্ঠা ৬৫]

.



□>{{গল্পেটিতে বিজ্ঞান কি বলে! শুধু তাই নয় বরং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকেই প্রমোট করা হয়েছে। এখানে একথা বলার অবকাশ নেই যে, শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক থিউরিকে ইংগিত করাই সাজিদের উদ্দেশ্য ছিল বরং সাজিদের বক্তব্যে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, সে-ও এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী। এই বিশ্বাস মূলত ইসলামী আক্বীদা পরিপন্থী। আমরা কুরআন, সুন্নাহ ও উলামাদের স্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা সেটি পর্যালোচনা করবো। ওয়া বিল্লাহিত তাওফীক।

আক্বীদা প্রমাণের জন্য যদিও কুরআন, সুন্নাহ ও উলামাদের বক্তব্যই যতেষ্ট তারপরও সর্বশেষে বিজ্ঞান মহলে সমাদৃত দুজন বিজ্ঞানীর বক্তব্য পেশ করবো যাতে পাঠকরা এটা বুঝতে পারেন যে কুরআন সুন্নাহর বিপরীতে বৈজ্ঞানিক থিউরি কতটুকু গ্রহণযোগ্য।}}



•

△কুরআন থেকেঃ

لِيَمْزِلَكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيِّ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا  
আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট পথে, এটা মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)-র  
নির্ধারণ(৩৬ঃ৩৮)

يَا فَلَكَ يَسْبَحُونَ كُلُّ فِي بُوِّ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَ  
আর তিনিই রাত ও দিন এবং সূর্য ও চাঁদ সৃষ্টি করেছেন; সবাই নিজ নিজ কক্ষপথে  
বিচরণ করে(২১ঃ৩৩)

وَّوَجَدَ عِنْدَهَا عَيْنَ حَمِئَةٍ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي  
يَهُمُّ حُسْنًا فَلَمَّا يَازَا الْقَرْيَتَيْنِ إِمَّا أَنْ تَعْدَبَ وَ إِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِي قَوْمًا  
অবশেষে যখন সে সূর্যাস্তের স্থানে পৌঁছল, তখন সে সূর্যকে একটি কদমাত্ত পানির  
ঝর্ণায় ডুবতে দেখতে পেল এবং সে এর কাছে একটি জাতির দেখা পেল। আমি  
বললাম, ‘হে যুলকারনাইন, তুমি তাদেরকে আযাবও দিতে পার অথবা তাদের  
ব্যাপারে সদাচরণও করতে পার’|(১৮ঃ৮৬)

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ □ رَاقِمِ الصَّلَاةِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ  
كَانَ مَشْهُودًا  
সূর্য হেলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম কর এবং  
ফজরের কুরআন। নিশ্চয় ফজরের কুরআন (ফেরেশতাদের) উপস্থিতির  
সময়(১৭ঃ৭৪)

۳۳ وَالنَّهَارَ (وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ) وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ  
আর তিনি সূর্য ও চাঁদকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন বিরামহীনভাবে এবং  
তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে(১৪ঃ৩৩)

لِيَ الْعَرْشِ وَسَخَّرَ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَ  
رَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ □ يَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى □ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ  
لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ

আল্লাহ, যিনি খুঁটি ছাড়া আসমানসমূহ উঁচু করেছেন যা তোমরা দেখছা অতঃপর তিনি আরশে উঠেছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়োজিত করেছেন। এর প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে। তিনি সবকিছু পরিচালনা করেন। আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেন, যাতে তোমাদের রবের সাক্ষাতের ব্যাপারে তোমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হতে পারা(১৩ঃ২)

إِنَّمَا اسْتَوَىٰ عَلَىٰ رَبِّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ حَنِيئًا ۖ وَالشَّمْسَ ۖ وَ يَلُ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ الْعَرْشُ يُعْشَىٰ ۖ أَلِ الْعَالَمِينَ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ ۖ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْآمَرُ ۖ ۖ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ  
নিশ্চয় তোমাদের রব আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে উঠেছেন। তিনি রাতকে দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। প্রত্যেকটি একে অপরকে দ্রুত অনুসরণ করে। আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজী, যা তাঁর নির্দেশে নিয়োজিত। জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই। আল্লাহ মহান, যিনি সকল সৃষ্টির রব।(৭ঃ৫৪)

لَقَدْ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ لَّ بِذَا رَبِّي بِذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفْلَمًا رَأَى الشَّمْسُ بَارِغَةً قَا مِمَّا تُشْرِكُونَ

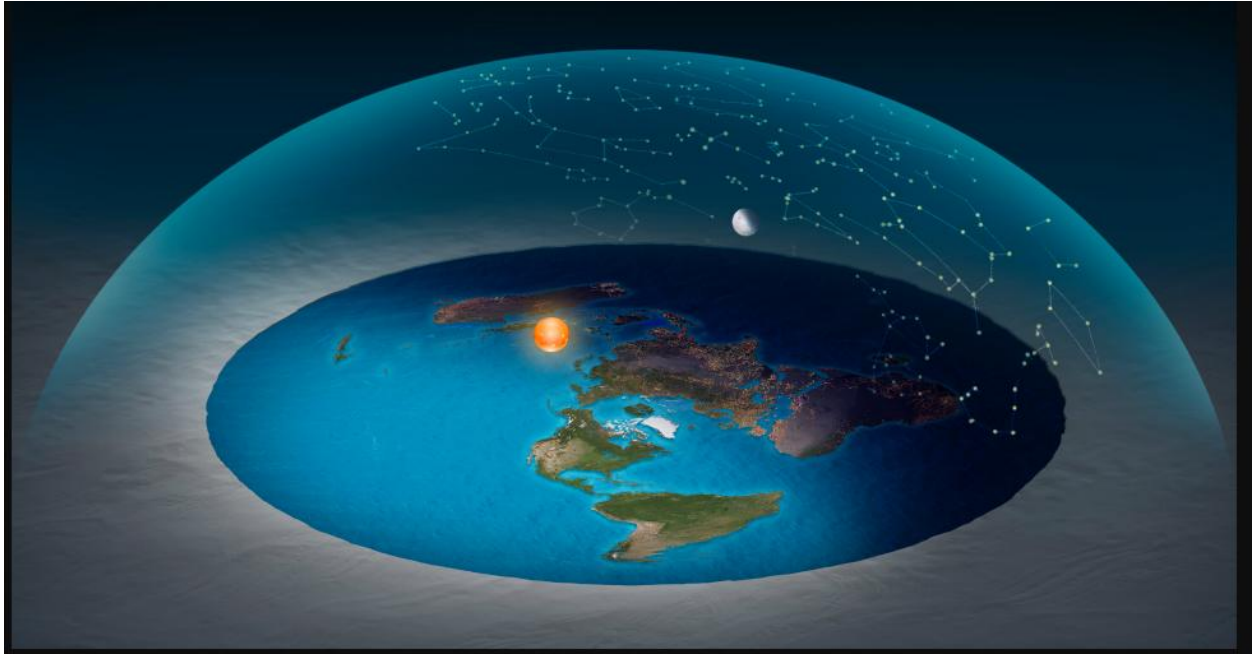
অতঃপর যখন সে সূর্য উজ্জ্বলরূপে উদীয়মান দেখল, বলল, ‘এ আমার রব, এ সবচেয়ে বড়’। পরে যখন তা ডুবে গেল, তখন সে বলল, ‘হে আমার কওম, তোমরা যা শরীক কর, নিশ্চয় আমি তা থেকে মুক্ত’।(৬ঃ৭৮)

بِهَا مِنَ الْمَغْرَبِ ۖ ثُمَّ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ ۖ قَالَ ابْرَاهِ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۖ ۖ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ

ইবরাহীম বলল, নিশ্চয় আল্লাহ পূর্বদিক থেকে সূর্য আনেন। অতএব তুমি তা পশ্চিম

দিক থেকে আনা ফলে কাফির ব্যক্তি হতভম্ব হয়ে গেলা আর আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।(২ঃ২৫৮)

{{আয়াত সমূহের বাহ্যিক অর্থ এটাই প্রমাণ করে যে সূর্য নির্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করে, উদয় হয়, হেলে পড়ে ও ডুবে যায়। এই বাহ্যিক অর্থকে প্রত্যাখ্যান করে বিজ্ঞানের সাথে সমন্বয়কৃত ব্যাখ্যা নিতান্তই একটি দুঃসাহসিক কাজ। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।}}



△হাদীস থেকেঃ

নবী ﷺ বলেছেন, ‘কোন একজন নবী জিহাদ করেছিলেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, এমন কোন ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে না, যে কোন মহিলাকে বিবাহ করেছে এবং তার সাথে মিলিত হবার ইচ্ছা রাখে, কিন্তু সে এখনও মিলিত হয়নি। এমন কোন ব্যক্তি ও না যে ঘর তৈরি করেছে কিন্তু তার ছাদ তোলেনি। আর এমন ব্যক্তিও না যে গর্ভবতী ছাগল বা উটনী কিনেছে এবং সে তার প্রসবের অপেক্ষায় আছে। অতঃপর তিনি জিহাদে গেলেন এবং ‘আসরের সলাতের

সময় কিংবা এর কাছাকাছি সময়ে একটি জনপদের নিকটে আসলেন। তখন তিনি সূর্যকে বললেন, তুমিও আদেশ পালনকারী আর আমিও আদেশ পালনকারী। হে আল্লাহ্! সূর্যকে থামিয়ে দিন। তখন তাকে থামিয়ে দেয়া হল। অবশেষে আল্লাহ তাকে বিজয় দান করেন।

(সহিহ বুখারী, ৩১২৪)

{{যদি পৃথিবীই ঘূর্ণায়মান হতো তাহলে আল্লাহর নবী (আঃ) সূর্যকে থামার নয় বরং পৃথিবীকে থামার দু'আ করতেন। এ-থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে সূর্যই গতিশীল। উক্ত হাদীসকে দলিল সাব্যস্ত করে শাইখ উবেইদ আল-জাবিরের বক্তব্য ব্যাপার টি আরো স্পষ্ট করবো}}

.

△ উলামাদের বক্তব্য থেকেঃ

কুরআন সূন্যাহর বাহ্যিক অর্থকে বিকৃত করে তা অপব্যখ্যা করার প্রবনতা যাদের মধ্যে রয়েছে তাদের সরূপ উন্মোচন করে উক্ত বিষয়ে উলামাদের স্পষ্ট বক্তব্য পেশ করা হলো:-

.

□ ইমাম আল-কুরতুবী(রাহিমাহুল্লাহ)(মৃ: ৬৭১হি.) তাঁর তাফসিরে তিনি বলেছেন: “মুসলিম ও আহলে কিতাবরা এই বক্তব্যের ওপর ঐক্যবদ্ধ যে পৃথিবী হলো সুস্থিরা” [তাফসিরে কুরতুবী সূরা আর-রা'দ(১৩ঃ৩)]

.

□ শাইখ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: “...কিন্তু ঐ ব্যক্তির কুফরির ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, যে ব্যক্তি চূড়ান্ত স্পষ্ট দলিল থাকা সত্ত্বেও সূর্যের কক্ষপথের ঘূর্ণন প্রত্যাখ্যান করে”(সংক্ষেপিত)

-[আল-আদিল্লা আল-নকল্লিয়াহ ওয়াল-হিসিয়াহ আলা যারআন আল-সামছ ওয়া

ছুকুন আল-আরদ (১৪০২হি.)]

□ শাইখ মুকবিল বিন হাদী(রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: “পৃথিবী গতিশীল কিনা, এই [প্রশ্নের ব্যাপারে] কুরআন কিংবা সুন্নহ প্রমাণ সাব্যস্ত করেনি। বরং, এই ব্যাপারে যে কথা বলে সে কুফরির কাছাকাছি কারণ সে জ্ঞান ব্যাতিত আল্লাহর ব্যাপারে [এমন কিছু] আরোপ করে এবং সে প্রত্যাখ্যান করে যা প্রতীক্ষ্যমাণ...।”

► সোর্স: <https://youtube.com/watch?v=Ymd4PiAgkuk> (অডিও)

□ শাইখ সালিহ আল-ফাওয়ান(হাফিযাহুল্লাহ) বলেছেন: “এই ব্যাপারে আমাদের অথবা ইমানদারদের মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, পৃথিবী হলো স্থির এবং সূর্য একে কেন্দ্র করে পরিভ্রমণ করে, যেমনটা তারকা অন্যান্য স্বর্গীয় উপাদন(আফলাক), পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করে। এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এটাই কুরআন ও সুন্নহতে সাবস্ত হয়েছে।”

► সোর্স: [https://www.youtube.com/watch?v=NH\\_NQisXTRE](https://www.youtube.com/watch?v=NH_NQisXTRE)

□ শাইখ উবেইদ আল-জাবিরকে জিজ্ঞেস করা হলো, “পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে যা জ্যোতির্বিৎদের দাবিকৃত বিশ্বাস, এটি কি কুফরি হিসেবে বিবেচ্য?

উত্তরে তিনি বলেন, “আমি ঐটা বলি যা কুরআন ও সুন্নহ নির্দেশ করেছে যে, সূর্য প্রবাহমান ও পৃথিবী সুস্থিরা”

[তার পর শাইখ একটি হাদীসের উল্লেখ করেন যার আংশিক এখানে বর্ণনা করা হলো:

একজন নবী (আঃ) জিহাদে গিয়ে আসরের সলাতের সময় কিংবা এর কাছাকাছি সময়ে একটি জনপদের নিকটে আসলেন। তখন তিনি সূর্যকে বললেন, “তুমিও আদেশ পালনকারী আর আমিও আদেশ পালনকারী। হে আল্লাহ! সূর্যকে থামিয়ে দিন।” তখন তাকে থামিয়ে দেয়া হল। অবশেষে আল্লাহ তাকে বিজয় দান করেন।”(বুখারী, ৩১২৪)]

উক্ত হাদীসকে দলিল সাব্যস্ত করে শাইখ বললেন যে, “যদি পৃথিবীই ঘূর্ণায়মান হতো, তাহলে নবীর সূর্যকে উদ্দেশ্য করা অনর্থক, এবং নবীগণ [এই সকল ক্ষেত্রে] ভুল কার থেকে মুক্ত।

এই বক্তব্য হলো কুরআন ও সুন্নাহর প্রত্য্যখ্যান যে, সূর্য স্থির। ইহা কুফরি মতবাদ এবং বেশিরভাগ জ্যোতির্বিৎরাই অজ্ঞ।”

► সোর্স: <http://ar.miraath.net/fatwah/5091>.

{{উলামাদের আলোক উজ্জ্বল স্পষ্ট বক্তব্য কোন ব্যাখ্যার দাবি রাখেনা। হে আল্লাহ আপনি তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন। }}

.

△বিজ্ঞানীদের বক্তব্য থেকেঃ

□আলবার্ট আইনস্টাইন(Albert Einstein) লিখেছেন: “Either coordinate system could be used with equal justification. The two sentences, ‘the sun is at rest and the earth moves,’ or ‘the sun moves and the earth is at rest.’”

-[The Evolution of Physics (Simon and Schuster, 1988), page 212.]

□ □ অনুবাদ: “এই দুটি বাক্য, ‘সূর্য স্থির এবং পৃথিবী গতিশীল’ অথবা ‘সূর্য গতিশীল এবং পৃথিবী স্থির’, উভয় সমশ্রেণীভূক্ত সিস্টেমই সমমূল্যায়নে ব্যবহৃত হতে পারো”

□ স্টিফেন হকিং(Stephen Hawking) লিখেছেন: “one can use either picture as a model of the universe, for our observations of the heavens can be explained by assuming either the earth or the sun to be at rest.”  
-[Stephen Hawking. The Grand Design, Bantam (2011) pages 41-42 (2010) page 39.]

□ □ অনুবাদ: “মহাবিশ্বের মডেল হিসেবে উভয় চিত্রই একজন ব্যবহার করতে পারে, কারণ আমাদের আকাশ পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যা সূর্য কিংবা পৃথিবীকে স্থির ধরে করা যেতে পারে”

□ {{ বিজ্ঞানীদের বক্তব্য উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে আক্বীদা প্রমাণ করা নয় বরং বৈজ্ঞানিক থিউরিকে চূড়ান্ত সত্য ভেবে বসে থাকা ভাইদের ঘুম ভাঙানোই উদ্দেশ্য।

কুরআন, সুন্নাহ ও আধুনিক এস্ট্রোনমি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ <http://aboutatheism.net/?atidxsu.}}>

~ পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের সালাফদের আক্বীদা ও মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন, নব্য আবিষ্কৃত সকল ফিতনা থেকে হেফাজত করেন ও জান্নাতুল ফেরদৌসে একত্রিত করেন।

□ নিবন্ধটি লিখতে সাহায্য নেওয়া হয়েছে [abuiyaad.com](http://abuiyaad.com) প্রণীত

“Qurānic Evidences For the Motion of the Sun



## Being Responsible for the Phenomena of Night and Day” থেকে।

•

N:B: (R:M) বিজ্ঞানীদের বিষয়টি আনার কোনো প্রয়োজন ছিলোনা। তবুও আনার কারণ হচ্ছে, কিছু মানুষ বলাকার পৃথিবী প্রমানের জন্য মুসলিম নামধারী এসব কথিত বিজ্ঞানীদের প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে আসে। আবার অনেকে প্যারাদক্লিক্যাল সাজিদকেও রেফারেন্স হিসেবে প্রদর্শন করে। তাই এসব বিষয়েও যেন কেউ কোনো আওয়াজ দিতে না পারে, সেজন্যই ওই আর্টিকেল গুলো এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ সহজ করুন।

### উপসংহার:

ইচ্ছা ছিল, এই খন্ডের ভিতরে সব আলোচনা নিয়ে আসার। এবং এই খন্ডে পুরো সমাপ্ত করার। কিন্তু ছদ্মবিজ্ঞানের ব্যাবচ্ছেদ করতে গিয়ে এই খন্ডটা অনেক বড় হয়ে গেছে। ফলে, আরো অনেক জরুরি কিছু আর্টিকেল আনতে পারিনি। তাই বাধ্য হয়ে চতুর্থ খন্ড করতে হচ্ছে। সেখানে অনেক গুলো বিভ্রান্তির নিরসন ঘটানো হবে এবং অনেক গুলো প্রশ্নের উত্তরও থাকবে, ইনশাআল্লাহ। সবার কাছে দোআ চাচ্ছি। আল্লাহ তায়ালা যেন, পরের খণ্ডটিও সাজিয়ে ঘুছিয়ে আপনাদের হাতে তুলে দেয়ার তৌফিক দান করেন। আল্লাহুম্মা আমিন।

(৩য় খন্ড সমাপ্ত)

